ভে ত রে

বিশ্বাসঘাতকতা ও হুঁশিয়ারি জারির ১০০ দিন ... ২
এ আই সি সি টি ইউ-র প্রচার পর্ব ... ৩
বিশ্বভারতী ও যাদবপুর ঃ যে প্রশ্নগুলো উঠছে ... ৪
প্রমাণ করুন 'সততার প্রতীক' ... ৫
বিদেশে সাম্প্রদায়িক ভাষা ... দেশে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস... ৬
চলে গেলেন ইতিহাসবিদ বিপান চন্দ্র ... ৭

গণদাবী

₹৩

পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার,
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮
বার্ষিক গ্রাহক — ১৫০ টাকা
(৪৮টি সাধারণ সংখ্যা ও একটি বিশেষ সংখ্যা)
ষান্মাসিক গ্রাহক — ৮০ টাকা (২৬টি সংখ্যা)
১০টি বার্ষিক গ্রাহক একত্রে জমা দিলে
প্রতি সংখ্যায় ১টি পত্রিকা বিনামূল্যে

খণ্ড ২১ সংখ্যা ৩০ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৪

মমতা ব্যানার্জী ও মুকুল রায়কে অবিলম্বে জেরা করুক সি বি আই

সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ ৯ সেপ্টেম্বর প্রেস বিবৃতিতে বলেন, 'সততার প্রতীক' বলে বিজ্ঞাপিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ও তাঁর দল আজ দুর্নীতির অক্টোপাশে জড়িয়ে পড়েছে। সারদা কেলেঙ্কারীতে অভিযুক্ত তৃণমূলের নেতা, মন্ত্রী, আমলা, প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিক, ময়দানের কর্মকর্তা, সংবাদপত্রের সম্পাদক তথা কর্মচারী, সংবাদ চ্যানেলের সাংবাদিকরা—একের পর এক সি বি আই-এর কাছে সারদা তদন্তের তথ্য উদঘাটন করে চলেছেন। দুর্নীতিতে এরা যেমন জড়িয়ে পড়েছেন, তেমনি একইভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায় ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর জ্ঞাতসারেই এই দুর্নীতি সংগঠিত হয়েছে বলে তাঁরা জানাচ্ছেন। লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট আমানতকারীকে পথে বসিয়ে এই সমস্ত অপরাধীরা এখনও অবাধে নিজেদের ক্লিনচিট সার্টিফিকেট দিচ্ছেন। প্রকৃত সত্য উদঘাটনের জন্য সি বি আই অবিলম্বে মমতা ব্যানার্জী ও মুকুল রায়কে জেরা করুক। তাহলেই সারদা কেলেঙ্কারীর রহস্য উন্মোচিত হবে।

পরিবর্তনপন্থী বুদ্ধিজীবীরা, যাঁরা মা-মাটি-মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠায় পথে নেমেছিলেন তাঁরা এতবড় দুর্নীতির পরও নীরব কেন এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠছে। রাজ্যের সমস্ত বামপন্থী গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে আমাদের আবেদন সারদা সহ অন্যান্য চিটফাণ্ড কেলেঙ্কারীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন।

কেলেঙ্কারীতে যুক্ত সমস্ত নেতা-মন্ত্রী, আমলা, পুলিশ অফিসার সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হোক এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ও মুকুল রায়কে সি বি আই জেরা করুক এই দাবিতে রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সি পি আই (এম এল) লিবারেশন।

মোদী সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও শ্রমিক শ্রেণীর ওপর আক্রমণ নামানোর বিরুদ্ধে উন্মোচন প্রচার পর্বের সমাপ্তি-কর্মসূচীতে শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ, মিছিল। রিপোর্ট তিনের পাতায়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিগ্রহ—খাপ পঞ্চায়েতী মানসিকতা

শাস্তির দাবিতে মহিলা সংগঠনের স্মারকলিপি

যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ঘটনাটা কেবল যৌন নিগ্রহেরই ছিল না। স্পষ্টতই এটি একদল পুরুষ ছাত্রের মর‍্যাল পোলিসিং-এর। কলকাতার বুকে খাপ পঞ্চায়েতী মানসিকতার। আমরা খবরের কাগজ এবং ছাত্রদের মুখে খবর পেয়ে সরাসরি আক্রান্ত ছাত্রীর সাথে যোগাযোগ করি। ৮ সেপ্টেম্বর সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতির পক্ষে ১১ জনের প্রতিনিধিদল গিয়ে দেখা করি ভাইস চ্যান্সেলারের অফিসে এবং যাদবপুর থানায়। আমাদের স্মারকলিপিতে বলি যে ঘটনার পর দশ দিনের বেশি কেটে গেলেও ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ দোষী ছাত্রদের বিরুদ্ধে কোনওরকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেননি। অথচ দোষীদের মধ্যে একজনের নাম এফ আই আর-এ রয়েছে। এবং আরও কয়েক জনকে ছবি দেখে চিহ্নিত করেছেন আক্রান্ত ছাত্রী। আমরা দোষী ছাত্রদের অবিলম্বে হোস্টেল ও ইউনিভার্সিটি থেকে বহিষ্কার করার দাবি জানাই। (থানায় দাবি জানাই অবিলম্বে তাদের গ্রেপ্তার করার)। ওল্ড পিজি বয়েস হোস্টেলের সুপার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিগ্রহের ঘটনা দেখেছেন। অথচ ছাত্রদের বাধা দেননি বা তাদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগও করেননি। দায়িত্বে চরম গাফিলতির জন্য তাঁকে শো-কজ করে সাসপেণ্ড করার দাবি তুলি। একইভাবে চরম নিন্দনীয় ইন্টারনাল কম্পলেইন্টস কমিটির দুই সদস্যের ভূমিকা। তাঁরা আক্রান্ত ছাত্রীর বাড়িতে হাজির হয়ে তার পোশাক, আচার-ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন করেন এবং এর মাধ্যমে তাকেই ঘুরিয়ে ঘটনার জন্য দায়ী করার ইঙ্গিত দেন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাম্পাসে স্বাধীন চলাফেরার ওপরেই আরও নিষেধাজ্ঞা চাপানোর হুমকি দেন। মূল অভিযোগের পর থেকে ইউনিভার্সিটির গোটা প্রতিক্রিয়ার ঘটনাক্রমের জোরালো ভাষায় নিন্দা জানাই আমরা। ঐ দুই সদস্যকে ইন্টারনাল কমিটি থেকে বরখাস্ত করার দাবি রাখি। স্মরণ করিয়ে দিই যে ক্যাম্পাসে সম্পূর্ণ ভয়মুক্ত পরিবেশে ছাত্রীদের স্বাধীন চলাফেরার পরিবেশ নিশ্চিত করতেই হবে। ছাত্রীদের ওপর নীতি পুলিশদের জুলুম এবং নিগ্রহের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে। এবং দীর্ঘমেয়াদীভাবে ক্যাম্পাসে লিঙ্গসচেতনতা এবং লিঙ্গসাম্যের ধারণা গড়ে তোলার জন্য ধারাবাহিক পদক্ষেপ নিতে হবে। মিটিংয়ে উপস্থিত হয়ে রেজিস্ট্রার যখন বলার চেষ্টা করেন যে 'ডিসিপ্লিন'-এর অভাবেই যৌন নিগ্রহের ঘটনা ঘটছে তখন তাঁকে আমরা স্মরণ করিয়ে দিই পার্ক স্ট্রীট থেকে ম্যাঙ্গালোরের পাব, দিল্লীর খিরকি থেকে আজকের যাদবপুর। মেয়েদের 'চরিত্র' 'পোশাক' 'ডিসিপ্লিন'-এর ধুয়ো তুলে যৌন নিগ্রহের সাফাই দেওয়া পুরুষতন্ত্রের পুরনো কায়দা। এটা ব্যাধির প্রতিষেধক তো নয়ই। বরং ব্যাধিরই জলজ্যান্ত সিম্পটম। 'ভিক্টিম-ব্লেমিং' বা আক্রান্তকেই দোষী করার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে জোরদার প্রতিরোধ খাড়া করতে হবে। প্রতিবাদের মুখে পড়ে আমতা আমতা করে রেজিস্ট্রার তখনকার মত তাঁর কথা প্রত্যাহার করে নিলেও পুরুষতান্ত্রিক 'কমন সেন্সের' বীজটা যে তাঁদের মস্তিষ্কোর অনেক গভীরে বাসা বেঁধেছে এবং তাকে তাড়াতে শুধু জোর ধাক্কা নয় একটা বিস্ফোরণের প্রয়োজন হবে। গত দেড় দিনের ঘটনা ('এই সময়' কাগজের ইয়েলো জার্নালিজম, আন্দোলনকারী সাধারণ ছাত্রদের শঙ্কুদেব পণ্ডার পাল্টা হুঁশিয়ারি এবং কর্তৃপক্ষের পেণ্ডুলামের মত মাথা নাড়া পর্যন্ত) তা-ই প্রমাণ করে। আগামীদিনে মহিলা সমিতির প্রতিনিধিরা ছাত্রী নিগ্রহের ঘটনায় সমস্ত

পাঁচের পাতায় দেখুন

২০১২-র ১৬ ডিসেম্বর ধর্ষণ-বিরোধী প্রতিবাদে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে দিল্লী পুলিশের চার্জশীট!

দিল্লী পুলিশ আইপোয়া (সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতি), আইসা, আর ওয়াই এ কর্মীদের জানিয়েছে যে, ২০১২-র ১৬ ডিসেম্বরের ধর্ষণের প্রতিবাদে ঐ বছরের ১৯ ডিসেম্বর শীলা দীক্ষিতের বাড়ির সামনে আন্দোলনের জন্য তাদের বিরুদ্ধে চার্জশীট পেশ করা হয়েছে। যাদের বিরুদ্ধে চার্জশীট দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন আইপোয়ার সম্পাদিকা কবিতা কৃষ্ণাণ, এ আই এস এ কর্মী দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের আনমোল রত্তন এবং আর ওয়াই এ কর্মী আসলাম খান।

সেদিনের প্রতিবাদ দিল্লী এবং তার সাথে সারা দেশে ধর্ষণ-বিরোধী প্রতিবাদকে জাগিয়ে তোলে। ঐ প্রতিবাদে দিল্লী পুলিশ সেদিন ধর্ষণ-বিরোধী প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে জলকামান ব্যবহার করে। পুলিশের পাশবিকতা, বাড়াবাড়ি এবং হেনস্থা মাত্রাগত দিক থেকে এতটাই বেশি ছিল যে, বিচারপতি ভার্মা কমিটিও সে ব্যাপারে মন্তব্য না করে পারেনি।

ঐ ঘটনার এক বছরেরও বেশি সময় বাদে দিল্লী পুলিশ ধর্ষণ-বিরোধী আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে চার্জশীট দিল, এটা যে একেবারে ওপরতলার সবুজ সংকেত ছাড়া হতে পারে না সেটা যে কেউই মানবেন। দিল্লী পুলিশ হল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনস্ত। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় এবং জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের নির্বাচন যখন একেবারেই সামনে তখন এ আই এস এ সংগঠকদের বিরুদ্ধে চার্জশীট দেওয়া হল কেন, বিশেষভাবে ঐ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ আই এস এ যখন এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী?

প্রতিবাদের সময় প্রতিবাদকারীদের ওপর নির্মম আচরণের জন্য কংগ্রেস সরকার ও দিল্লী পুলিশের সমালোচনা করেছিল বিজেপি। তাহলে আজ দিল্লী পুলিশ যখন বিজেপি সরকারের অধীন তখন ঐ পুলিশ প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে চার্জশীট কেন দিচ্ছে? এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, এর আগে মনমোহন সরকারের মতনই মোদী সরকারও প্রতিবাদকারীদের, বিশেষভাবে যারা নারী স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে তাদের অপরাধী বলে মনে করে।

আইসা, আইপোয়া এবং আর ওয়াই এ দাবি করছে যে, তাদের কর্মী সহ যে সমস্ত প্রতিবাদকারী ২০১২-১৩ বর্ষে ধর্ষণ-বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল তাদের সবার বিরুদ্ধে মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। যাদের বিরুদ্ধে চার্জশীট দেওয়া হয়েছে তারা বলেছেন, ''আমরা এবং আরও হাজার হাজার মানুষ নারীর অধিকার এবং তার সাথে দলিত-মুসলিম এবং অন্যান্য প্রান্তিক মানুষের অধিকারের জন্য লড়াই চালিয়ে যাবো, ঠিক যেমন আমরা লড়াই করেছিলাম ১৯ ডিসেম্বর। এই সরকার এবং দিল্লী পুলিশ যদি মনে করে যে, এটা এমন একটা অপরাধ যার জন্য আমাদের গ্রেপ্তার করতে হবে, তবে তাই হোক।''

সম্পাদকীয়

বুঝতে হবে—রুখতে হবে

বিজেপির নয়া সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ্ পশ্চিমবঙ্গে আসতে শুরু করে দিয়েছেন। গত লোকসভা নির্বাচনে এরাজ্যে বিজেপির সাংসদ আসন সংখ্যা বেড়েছে এক থেকে দুই, ভোট বেড়ে হয়েছে ১৭ শতাংশ, ভোট বৃদ্ধি হয়েছে বামফ্রন্টের ভোট ব্যাঙ্ক ভেঙ্গে, দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের চোখে পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয়তার বৃদ্ধি ঘটানোটা এক বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদত্ত পলিসি। অমিত শাহ্ জাতীয় স্তরে বিজেপির 'টীম অমিত শাহ্' বানানোর পর এরাজ্যে যখন চৌরঙ্গী ও বসিরহাট (দক্ষিণ) কেন্দ্র দুটিতে উপনির্বাচন হতে চলেছে, সেই উপলক্ষে তাঁর অমিতবিক্রম প্রদর্শন শুরু করে দিলেন। নরেন্দ্র মোদীর বর্তমান দুনম্বর ক্ষমতাবান এই নেতাটি তাঁদের দলকে এখানে ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সিঙ্গা ফুঁকে দিলেন। তিনি বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখাকে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের রাজনীতিতে নামার ফরমান জারী করলেন। বিজেপি দলটা গেরুয়া সামরিক শৃঙ্খলার দল হিসেবেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। আর সেই ভরসাতেই শাহের বক্তব্য হল, যেহেতু সারদা কেলেঙ্কারি-নারী নির্যাতন ইত্যাদি নানা ঘটনা ও প্রবণতায় এখানে তৃণমূল শাসন জন্ম দিচ্ছে এক নতুন রাজনৈতিক অস্থিরতার, সেখানে পরিসর বাড়াতে হলে প্রয়োজনে রুখে দাঁড়ানোর, রক্ত ঝরানোর, আগুনে ঝাঁপানোর ঝুঁকি নেওয়া শুরু করে দিতে হবে। বিজেপির কেন্দ্রীয় ক্ষমতা করবে তার কাজ, তবে কেন্দ্রের ওপর নির্ভরতা ছেড়ে রাজ্যকে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধিয়ে দিতে হবে। শাহের বার্তা অতএব নতুন এক আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়ারই সংকেত জানান দিচ্ছে। গুজরাট থেকে উত্তরপ্রদেশ, আসাম থেকে উড়িষ্যা—বিভিন্ন রাজ্য পরিস্থিতিতে সর্বত্রই বিজেপির উত্থান-পুনরুত্থান ঘটানোর পেছনে যে সংঘর্ষের রাজনীত অতি পরিচিত, তা আপাতদৃষ্টিতে শাসকের বিরুদ্ধে গণঅসন্তোষকে পুঁজি করা ও তাকে ভাষা দেওয়ার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক হাবভাব-চমক-রূপ পরিগ্রহণ করলেও সারবস্তুতে মতাদর্শগত-রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকীকরণের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায়। শাহের উস্কে দেওয়ার পেছনে ঠিক এইরকম দুটি আশু নির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে দুটি বিধানসভা উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে। আর পরবর্তীতে বড় নির্দিষ্ট লক্ষ্য হল ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচন। শাহ যে রাজনীতির সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়াতে চাইছে তার এক জ্বলন্ত নমুনা হল, বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশের অহেতুক জিগির তুলে তাকে সংখ্যালঘু বিরোধী একটা 'ইস্যু' পাকিয়ে তোলার বদমায়েশী। এরকমভাবে বামফ্রন্ট আমল ও তৃণমূল আমলের সংস্কার কর্মসূচীর কুফলগুলোতেও সাম্প্রদায়িক রঙ মিশিয়ে ফায়দা লুঠতে চাইবে।

পক্ষান্তরে, বিজেপির অমিত শাহের কষা ছককে পাল্টা মোকাবিলা করতে হবে তার হাজির করা নির্দিষ্ট ইস্যু ও নকশাগুলোকে তুলোধোনা করে, কেন্দ্রে বিজেপি জমানা কেমন ধনাঢ্যশ্রেণীগুলোর জন্য অবাধ 'সুদিন' আর গরিবদের জন্য অন্তহীন দুর্দিন নিয়ে আসছে—সেই চিত্র জোরের সাথে পাল্টা তুলে জনগণের স্বার্থে রাজনৈতিক ঘেরাও চালিয়ে যেতে হবে।

পশ্চিমবাংলার সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী এক দীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল। এখানে আর এস এস মতাদর্শ ও রাজনীতির অর্ধশত বছরেরও বেশী সময় যাবত কোন বিশেষ শেকড় ছিল না। হিন্দুমহাসভার এক অন্যতম স্থপতি শ্যামপ্রসাদ মুখার্জী এই রাজ্যবাসী হলেও সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্বের মতাদর্শ-রাজনীতি এখানে গত একদশক আগে পর্যন্ত বলতে গেলে কল্কে পেত না। কিন্তু পরিতাপ বা প্রহসনের বিষয় হল, বিগত বামফ্রন্ট আমলের অধঃপতন এবং বর্তমানে তৃণমূল আমলের দুর্নীতি, নৈরাজ্য ও অপশাসন বিজেপিকে পরিসর ক্রমশ বাড়াতে সুবিধা করে দিয়েছে। বলাবাহুল্য, তৃণমূল তো একসময় বিজেপির হাতও ধরেছিল।

তবু এই সাম্প্রদায়িক-রাজনৈতিক শক্তি যা বাড়তে পেরেছে সেখান থেকে তাকে আর বাড়তে দেওয়া যায় না। তাকে রুখে দেওয়ার পাল্টা উদ্যোগ এখন সময়ের এক বিশেষ দাবি। তবে বিজেপিকে মোকাবিলার গুরুত্ব মানে এখানে অধঃপতিত সি পি এম বা বামফ্রন্ট মডেলের পুনরুত্থান ঘটাতে হবে তা হতে পারে না; অথবা তৃণমূল রাজত্ব যতই অত্যাচারি ও দুর্নীতিগ্রস্ত হোক এর সাথেই মানিয়ে চলতে হবে তাও নয়; বরং তৃণমূলের জনবিরোধী জমানাকে মোকাবিলার পথে এক সংগ্রামী বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির শক্তিশালী আত্মঘোষণার ও সমন্বয় সাধনের নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে আঁকড়ে ধরা উচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই এরাজ্যে বিজেপির মোকাবিলায় আসুন, নতুন পর্বের সূচনায় একজোট হতে শুরু করি।

একটি আবেদন

জম্মু ও কাশ্মীরের বন্যাকবলিত জনগণকে মুক্ত হাতে সাহায্য করুন

জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণ ষাট বছরে এক সর্বগ্রাসী বন্যায় বিধ্বংসী দুর্দশা ভোগ করছে। মৃত্যুর তালিকা পাহাড়ছোঁয়া হচ্ছে, এমনকি হাজার হাজার মানুষজন হারিয়েছে তাদের ঘরবাড়ি, কর্মক্ষেত্র এবং বেঁচে থাকার উপায়। জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের প্রতি আমাদের সংহতি ও সহায়তা রাখা প্রয়োজন।

উত্তরাখণ্ডে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতোই, জম্মু ও কাশ্মীরে বন্যায় সবকিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আর সেটা হয়েছে নির্বিচারে পরিবেশের ব্যাপক ধ্বংস হওয়া এবং জনগণকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে শোচনীয় ব্যর্থতা থেকে যাওয়ার কারণেই।

জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের বন্যাত্রাণের জন্য সি পি আই (এম এল) দেশজুড়ে এক অভিযান নামাচ্ছে। পার্টির সমস্ত রাজ্য শাখা, সমস্ত গণসংগঠনকে অনুরোধ করা হচ্ছে তহবিল সংগ্রহ করে ত্রাণ অভিযানে দান করুন। আমরা সকল উদ্বিগ্ন জনতার কাছে আবেদন রাখছি, আপনারা অর্থ দান করুন চেক/ড্রাফট পাঠিয়ে এবং "সি পি আই (এম এল)" নামে। সাহায্য পাঠানোর ক্ষেত্রে উল্লেখ করুন "জম্মু ও কাশ্মীরের বন্যাত্রাণ"। সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা—ইউ-৯০, সাকারপুর, দিল্লী, ১১০০৯২, ইণ্ডিয়া।

কেন্দ্রীয় কমিটি
সি পি আই (এম এল) লিবারেশন

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী লেনিনবাদী) লিবারেশন
ইউ-৯০, সাকারপুর
দিল্লী-১১০০৯২, দূরভাষ-৯১১১২২৫২১০৬৭, ফ্যাক্স-৯১১১২২৪৪২৭৯০,
web : http//www.cpiml.org

বিশ্বাসঘাতকতা ও হুঁশিয়ারি জারির ১০০ দিন

এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতের প্রথম বিজেপি সরকারের প্রধানমন্ত্রী রূপে নরেন্দ্র মোদী শপথ নেওয়ার পর থেকে ১০০ দিন পার হয়ে গেছে। আর এই ১০০ দিন অত্যন্ত কঠোর ও তিক্তরূপে দেখা দিয়েছে, যা নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুত স্বপ্নিল ও মধুর ধরনের দিন থেকে একেবারে আলাদা। নতুন সরকার এখনও পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে সূত্রায়িত কোন পলিসি এজেণ্ডাকে খুলে না ধরলেও আমাদের সামনে এমন যথেষ্ট বিবৃতি ও সংকেত রয়েছে যা দিয়ে বোঝা যায় যে সরকার কোন অভিমুখে এগোচ্ছে। আর নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপি যখন সরকারের নেতৃত্বে রয়েছেন তখন শুধুই সরকারের ওপর নজর কেন্দ্রীভূত করাটাও কাজের নয়। দল ও সংঘ পরিবারের হরেকরকম শাখা ও জোট শরিকদের কার্যকলাপও পরিপার্শ্বের ওপর যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে।

কর্মনীতি সম্পর্কিত উদ্যোগগুলো সম্পর্কে বলা যায়, নতুন সরকার ইউ পি এ-র সুপরিচিত এজেণ্ডাকেই আরও জোরালোভাবে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বলতে গেলে গোটা অর্থনীতিটাকেই এখন বিদেশী পুঁজির কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, আর নরেন্দ্র মোদী ঔপনিবেশিক শাসন থেকে ভারতের স্বাধীনতা বার্ষিকীতে বিদেশী পুঁজির কাছে নাটকীয় ভঙ্গীতে আহ্বান জানিয়েছেন, ''আসুন, ভারতে তৈরি করুন''। রেল থেকে লগ্নী ক্ষেত্র এবং এমনকি প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও এখন বিদেশী পুঁজির গভীরতর অনুপ্রবেশ ঘটবে এবং অর্থনৈতিক প্রশাসনের নেহরুর উত্তরাধিকারের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে ছেদ ঘটানোর লক্ষ্যে নতুন সরকার যোজনা কমিশনকে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রণালীবদ্ধভাবে বিলগ্নিকরণকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যার ফলে বেসরকারি কর্পোরেশনগুলো এবার ভারতের বিপুল সম্পদ, সস্তা শ্রম এবং ক্রমবর্ধমান বাজারকে আরও যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করতে পারবে।

বৃহৎ পুঁজিকে আরও অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে সরকার শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের কাঠামোকে বিপর্যস্ত ও দুর্বল করে তুলতে বদ্ধপরিকর বলে মনে হয়। শ্রম আইনকে বড় আকারে সংশোধন করে তোলার প্রস্তাব করা হচ্ছে, খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্ম নিশ্চয়তা আইনগুলোকে নখদন্তহীন করে তোলা হচ্ছে এবং নির্বিচারে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে যে সুরক্ষা ব্যবস্থা ছিল তাকেও সুপরিকল্পিতভাবে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। খাদ্য, বাসস্থান, নির্মলীকরণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কাজের সর্বজনীন অধিকারকে সুনিশ্চিত করার পরিবর্তে সরকার সাংসদ/বিধায়ক তহবিল এবং তথাকথিত কর্পোরেট বদান্যতার মাধ্যমে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। জন ধন প্রকল্প যতটা প্রতীকি চরিত্রের, সারবস্তুতে ততটা নয় ঃ এই প্রকল্প শ্রমজীবী জনগণের আয়ের চূড়ান্ত রূপের নিম্ন স্তরকে ওপরে তোলার কোনও দিশা না দিয়ে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, ডেবিট কার্ড এবং ভড়ংদার বীমার পরিমাণের মাধ্যমে সবার জন্য আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বলছে।

মোদী বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে একগুচ্ছ উদ্যোগকে সামনে আনার চেষ্টা করছেন, সর্বপ্রথম যা দেখা যায় তাঁর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অপ্রত্যাশিতভাবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণের মাধ্যমে। প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনার প্রতিশ্রুতির জায়গায় এখন দেখা যাচ্ছে পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা বাতিলের বাস্তবতা। গাজার ওপর ইজরায়েলের যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর সরকারের নীরবতা এবং ইজরায়েলি আগ্রাসনের নিন্দা করে সংসদে এমনকি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করতে অস্বীকার করাটা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের ভাবমূর্তিকে আরও কলঙ্কিত করেছে এবং তা ভারতকে কার্যত মার্কিন-ইজরায়েল যুদ্ধযন্ত্রের লেজুড়ে পর্যবসিত করেছে। একদিকে ব্রাজিলে ব্রিকস শীর্ষ বৈঠকে মোদীকে যেমন একেবারেই নিষ্প্রভ দেখিয়েছে, অন্যদিকে জাপানে তিনি সেখানকার লগ্নি প্রতিনিধিদের এমনকি ভারতের 'সিদ্ধান্ত-নির্ধারণ প্রক্রিয়া'র অংশ হয়ে ওঠার আমন্ত্রণ পর্যন্ত জানিয়েছেন। চীনের বিরুদ্ধে তাঁর তির্যক মন্তব্য এই বিষয়ে কারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রাখেনি যে, তাঁর সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের সঙ্গে ভারতকে চীন-বিরোধী অক্ষে যুক্ত করতে অত্যন্ত ব্যগ্র।

এইভাবে অর্থনৈতিক ও বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে নেহরুর ঐতিহ্যের শেষ চিহ্নটুকুকেও মুছে ফেলতে মোদীকে যেমন বদ্ধপরিকর বলে মনে হচ্ছে, তেমনি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং স্বৈরাচারি শাসনের ইন্দিরা ধরনকে সঞ্চার করতে তিনি অত্যন্ত তৎপরতা দেখাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় হয়ে উঠেছে অতীব ক্ষমতাশালী মন্ত্রীসভা যা অন্যান্য মন্ত্রীদের ওপর নজরদারি চালাচ্ছে। নির্বাচনের সময় দেওয়া 'সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয়তা'র বুলির বিপরীতে দেখা যাচ্ছে, ইউ পি এ আমলে নিযুক্ত রাজ্যপালদের পদত্যাগ করতে বাধ্য করে নির্লজ্জভাবে তাদের স্থানে আনা হচ্ছে রাজনৈতিক লোকজনদের এবং তা করা হচ্ছে রাজ্যগুলোকে কেন্দ্রের নাগপাশে বাঁধতে। বিচারপতিদের নিয়োগ থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার বিষয়—সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ এবং দলীয় নিয়ন্ত্রণই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। মোদী হুজুগ বিজেপির মধ্যেও আমূল রূপান্তরণ ঘটিয়েছে, যে দল একসময় কংগ্রেসকে বিদ্রুপ করত তার চাটুকারিতার সংস্কৃতির জন্য, সেই দলই এখন হয়ে উঠেছে মোদী ও তাঁর ডান হাতের—যিনি এখন দলের সভাপতি—একচ্ছত্র জায়গির।

সাধারণ ভারতবাসীর কাছে সবথেকে উদ্বেগের বিষয় কিন্তু এটা নয় যে মোদী নির্বাচনের সময় দেওয়া তাঁর 'সুদিন'-এর প্রতিশ্রুতিকে ভুলে গেছেন, ঐ উদ্বেগ বরং হয়ে উঠেছে গোটা সংঘ বাহিনীর দ্বারা অবাধে ও নির্লজ্জভাবে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ঘটানোর ব্যাপারটা। মুসলিম যুবকদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রসূত আক্রমণ সারা দেশে বিপজ্জনকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। ১৬ মে-র রায়ের পরপরই পুণেতে সফ্টওয়ার কর্মী মহসিন সিদ্দিক শেখ-এর হত্যা এবং ঐ হত্যাকে নিন্দা করতে মোদীর অস্বীকার করাটা একেবারে গোড়াতেই বিপজ্জনক সংকেত দিয়েছিল। মুসলিম ছেলের হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করার প্রতিটি ঘটনাতেই বিজেপির 'প্রেম জিহাদ' বলে শোরগেলা তোলা এবং উত্তরপ্রদেশে আসন্ন বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রচারে বিজেপির ভারপ্রাপ্ত হিসেবে যোগী আদিত্যনাথের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বন্যা ছোটানোয় ঐ সংকেত এখন দানবীয় আকার ধারণ করেছে। আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবত ইতিমধ্যে তাঁর দূরভিসন্ধিমূলক প্রচার শুরু করে ভারত ও ভারতবাসীকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে শুরু করেছেন—তাঁর কাছে 'হিন্দু' শব্দটি ভারতীয়রই সমার্থক! দৈহিক হিংসা থেকে মতাদর্শগত আক্রমণ পর্যন্ত বিস্তৃত ক্ষেত্রে ক্ষমতা মদমত্ত বিজেপি ও সংঘ বাহিনী উন্মত্তের মত দাপিয়ে বেড়াতে শুরু করেছে।

জনগণ কিন্তু জুলাই ও আগস্টের উপনির্বাচনে বিচক্ষণতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁরা কিন্তু অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মে মাসে মোদীকে যে রায় তাঁরা দিয়েছিলেন তা কখনই বিজেপির পক্ষে জনগণের জীবিকা ও নাগরিক স্বাধীনতা নিয়ে ছেলেখেলা করার লাইসেন্স ছিল না। মোদী প্রকাশ্যেই অনুযোগ করেছেন, নতুন শাসকরা সাধারণভাবে মধুচন্দ্রিমার যে সময়টা পেয়ে থাকে তিনি সেই সময়টুকু পাননি। যে বক্তৃতাবাজ জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন, নিজের হয়ে সাফাই গাওয়ার সুযোগ তিনি পেতে পারেন না। জনগণের উন্নয়ন আকাঙ্খা ও গণতান্ত্রিক দৃঢ়তাকে অবশ্যই সমস্ত স্বৈরাচারি ও সাম্প্রদায়িক অভিসন্ধিকে পরাস্ত করতে হবে।

(এল-এল আপডেট সম্পাদকীয়, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪)

মোদী সরকারের ১০০ দিনের বিশ্বাসঘাতকতা ও শ্রমিকদের অধিকারের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে এ আই সি সি টি ইউ-র দিল্লীতে ধর্ণা

মোদী সরকারের জনগণের প্রতি দেওয়া তার নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বিরুদ্ধে গত ৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লীর যন্তর মন্তরে কারখানার শ্রমিকরা, রাস্তার হকাররা, দিল্লীর পরিবহণ শ্রমিক, পরিচারিকা, স্বাস্থ্য ও শৌচালয় শ্রমজীবীরা এ আই সি সি টি ইউ-র ব্যানার নিয়ে শক্তিশালী ধর্ণা কর্মসূচী সংগঠিত করে।

প্রতিবাদী অবস্থানকারী শ্রমিকেরা শ্লোগান তুলে দাবি জানাচ্ছিলেন তাদের জানানো হোক 'সুদিন' নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি বাস্তবে দুর্দিনে পরিণত হল কেন, আর কেনই বা মোদী সরকার ইউ পি এ (৩) আমলের মতো আচরণ করে চলছে!

ধর্ণাস্থলে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, এ আই সি সি টি ইউ-র সর্বভারতীয় সম্পাদক রাজীব ডিমরি বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর নির্বাচনী প্রচারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, শ্রমজীবী মানুষের জন্য 'সুদিন' নিয়ে আসবেন। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলো পরিণতিতে যে মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি ও দুর্নীতি ডেকে নিয়ে আসে তা প্রবল গণঅসন্তোষের জন্ম দেয়, আর তার ফলশ্রুতিতে জনগণ মোদীর পক্ষে এক ব্যাপক গণরায় দেয়। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর, দেখা যাচ্ছে, সেই মোদী সরকার ইউ পি এ সরকারের মতোই একই অর্থনৈতিক নীতি চালাতে শুরু করেছে। ক্ষমতাসীন মোদী এখন জনগণকে বলছেন দেশের জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে— অথচ কর্পোরেট সংস্থাগুলোকে প্রচুর ছাড় বিলোচ্ছেন। মূল্যবৃদ্ধি ঘটে চলেছে অবাধে, মজুতদারী চলে গেছে নিয়ন্ত্রণের বাইরে, রেল ভাড়া ও পণ্য মাশুল বেড়েছে অভূতপূর্ব মাত্রায় এবং এটা আগামীদিনে পেট্রলের মূল্যবৃদ্ধির মতোই ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকবে।''

সমবেত শ্রমজীবী জনতার সামনে সারা ভারত কৃষিমজুর সমিতির (আয়ালা) সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ধীরেন্দ্র ঝা বলেন, ''তিন মাসের শাসন এবং পেশ করা বাজেট নিঃসন্দেহে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে মোদী সরকার আগের সরকারের নীতিগুলোকেই আগের চেয়ে আরও নির্মমভাবে প্রয়োগ করছে। সুদিন যদি এসেছে তো সেটা এসেছে আম্বানী, আদানী, টাটাদের জন্য— দেশের সাধারণ মানুষের জন্য নয়।'' রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিক্রীর ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে ৪৩ হাজার কোটি টাকার। এই সরকার বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়েছে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ৪৯ শতাংশ ও রেলওয়ে ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত। সেপ্টেম্বরের পরিকল্পিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে মোদী পরিষ্কার দুটো উপহার দেওয়ার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন— একটা হল বিমা ক্ষেত্র, অন্যটা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র। একদিকে কর্পোরেট ক্ষেত্র ৫.৩২ লক্ষ কোটি টাকার ছাড় পেয়েছে, অন্যদিকে রেল, রাস্তা ও বন্দর ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগের বেশীরভাগই যে পি পি পি মডেলে হয়ে চলেছে তার থেকে ফায়দা লুঠবে কর্পোরেট খেলুড়েরা। সরকারের বদান্যতায় কর্পোরেটদের পক্ষে অরণ্য সম্পদ, জমি ও খনিজ সম্পদ আত্মসাৎ করা সহজ হচ্ছে। সামাজিক ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, এন আর ই জি এ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দে আদৌ কোন সামাজিক নিরাপত্তা মেলার নয়। কেন্দ্রীয় সরকার যখন দাবি করছে যে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির চেষ্টা চালাচ্ছে সেই চেষ্টায় রয়েছে এন আর ই জি এ কর্মসংস্থানকে বেশ মাত্রায় গুটিয়ে নিয়ে তাকে নিছক এক প্রকল্পে পরিণত করতে।''

এ আই সি সি টি ইউ-র দিল্লী রাজ্য সম্পাদক সন্তোষ রাই বলেন,'' মোদী, নিজেকে যিনি 'পয়লা নম্বর মজদুর' দাবি করেন, তিনি আসলে শ্রমিকশ্রেণীর ওপর সর্বাত্মক আক্রমণ নামিয়েছেন। প্রথম তিন মাসের মধ্যে তিনি সুশাসন নিয়ে আসবেন বলেছিলেন, কিন্তু দেখা গেল শ্রম আইনে সংস্কার আনার ব্যাপারে তাঁর যা কিছু প্রস্তাব সবই কর্পোরেট পুঁজির সপক্ষে। এইসমস্ত সংশোধনী কর্মরত শ্রমশক্তির অধিকাংশকেই ফ্যাক্টরী আইন, আই ডি আইন, ক্লারা (সি এল এ আর এ), ট্রেড ইউনিয়ন আইনের আওতার বাইরে ফেলে দেবে। ইউনিয়ন করার অধিকার, ইউনিয়নের স্বীকৃতি আদায়ের বিষয়গুলোকে অধরা করে রাখা হচ্ছে। ফ্যাক্টরী আইনের কোপে নারী শ্রমিকরা কর্মক্ষেত্রে আরও শোষণের ও যৌন হয়রানির সম্মুখীন হবেন।''

অবস্থান কর্মসূচীতে এছাড়া বক্তব্য রাখেন এ আই সি সি টি ইউ-র দিল্লী রাজ্য শাখার সভাপতি ভি কে এস গৌতম, সি পি আই (এম এল) পলিটব্যুরো সদস্য প্রভাত কুমার, দিল্লী রাজ্য সম্পাদক সঞ্জয় শর্মা সহ এ আই সি সি টি ইউ, জনসংঘর্ষ মোর্চা এবং আর ওয়াই এ-র বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ।

শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ মিছিল

মোদী সরকারের প্রতিশ্রুতিভঙ্গের ১০০ দিনের মুখোশ উন্মোচন অভিযানের অঙ্গ হিসেবে ৩ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়িতে এ আই সি সি টি ইউ-র দার্জিলিং কমিটির উদ্যোগে সংগঠিত হল বিক্ষোভ মিছিল। দুপুর নাগাদ কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম পার্শ্ববর্তী সড়ক থেকে শুরু হয়ে শহরের হিলকার্ট রোড প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুশপুতুল পোড়ানো হয়, তার আগে মোদী সরকারের জনবিরোধী নীতি ও শ্রমিক বিরোধী নীতি লাগু করার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন এ আই সি সি টি ইউ-র রাজ্য সম্পাদক বাসুদেব বোস। বিক্ষোভ মিছিলে সামনে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সমিতির রাজ্য নেতা পবিত্র সিংহ, আইপোয়ার রাজ্য নেত্রী গৌরী দে, জেলা নেত্রী রুবী সেনগুপ্ত, আর ওয়াই এ নেতা অনীক চক্রবর্তী, এ আই সি সি টি ইউ-র জেলা সম্পাদক মোজাম্মেল হক, জেলা সভাপতি অভিজিৎ মজুমদার, পুলক গাঙ্গুলী, অপু চতুর্বেদী, পৈসাঞ্জু সিংহ প্রমুখ।

রায়গঞ্জে মিছিল ও সভা

অসহনীয় মূল্যবৃদ্ধি, শ্রম আইন সংস্কারের মাধ্যমে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার কেড়ে নেওয়া, বিদেশী পুঁজি ডেকে আনার নামে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র তথা জাতীয় সম্পদ লুঠ করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন বাড়িয়ে তোলা—এভাবেই মোদী সরকারের ১০০ দিনে শ্রমজীবী মানুষের জীবন জীবিকার ওপর হামলা নামিয়ে আনা হয়েছে। রেশন ব্যবস্থা গুটিয়ে আনা হচ্ছে, ভর্তুকি ছাঁটাইয়ের নামে সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পে যেটুকু ছিঁটেফোঁটা সুবিধা গরিব মানুষ পেতো সেটাকেও কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ১০০ দিনের কাজ বন্ধ করে কাজের অধিকারের সীমিত সুযোগ কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়গুলোতে প্রচার অভিযান সংগঠিত করে রায়গঞ্জ থানা এ আই সি সি টি ইউ-র উদ্যোগে ৩ সেপ্টেম্বর রায়গঞ্জ শহরে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে মিছিল ও প্রচারসভা করা হয়। মূলত নির্মাণ শ্রমিক, পরিচারিকা, বিড়ি শ্রমিক ও অন্যান্য অসংগঠিত শ্রমজীবীদের দুই শতাধিক মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেন। এর আগে প্রস্তুতি হিসাবে ৫টি কর্মী বৈঠক বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠিত হয়। এতে বিভিন্ন মেহনতী পেশায় যুক্ত গরিব মানুষদের ভালো অংশগ্রহণ ছিল। নীচুতলায় ধারাবাহিকভাবে উদ্যোগ নেওয়ার ফলে নতুন নতুন সম্ভাবনাগুলোও সামনে আসে। রায়গঞ্জ বাসস্ট্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় বক্তব্য রাখেন বর্ষীয়ান জেলা নেতা চন্দন চৌধুরী, জেলা শ্রমিক নেতা গণেশ সরকার, গোবিন্দ পাল। সমগ্র কর্মসূচীতে নেতৃত্ব দেন নির্মাণ শ্রমিক নেতা চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, সিদ্দিক আলি, মহিলা নেত্রী জয়া রায়, রুপিনা সোরেন প্রমুখ।

প্রচার কর্মসূচী দক্ষিণ ২৪ পরগণায়

১৬ আগস্ট থেকে ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ আই সি সি টি ইউ-র আহ্বানে মোদীর স্বরূপ উন্মোচনে দেশব্যাপী প্রচার কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় দুদিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী পালিত হয়। গত ২ সেপ্টেম্বর বাখরাহাট অঞ্চলে লোকাল কমিটি পার্টি অফিস থেকে বুড়ির পোল পর্যন্ত নির্মাণ শ্রমিকরা মিছিল করেন। এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন দাউদ আলি মণ্ডল। বুড়ির পোলে জনবহুল স্থানে সভা শুরু হতে সাধারণ মানুষ সামিল হতে থাকেন। সভাটি পরিচালনা করেন নিখিলেশ পাল। বক্তব্য রাখেন সি পি আই (এম এল) লোকাল কমিটির সম্পাদক দিলীপ পাল এবং এ আই সি সি টি ইউ-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কিশোর সরকার। বক্তাদের বক্তব্যের সারমর্ম ছিল—ইতিমধ্যে ১০০ দিনের মাথায় এসে মোদী সুদিনের পরিবর্তে জনগণকে তেতো বড়ি খেতে দিচ্ছেন, মূল্যবৃদ্ধি আকাশছোঁয়া হয়েছে এবং দেশের সমস্ত সম্পদ বহুজাতিকদের হাতে তুলে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করছে। বহুজাতিকদের স্বার্থে শ্রমিকদের অর্জিত অধিকার হরণ করতে শ্রম কানুনকে পরিবর্তন করতে চাইছে। কৃষিক্ষেত্রকে ধ্বংস করতে ভূমি বিল বহুজাতিকদের স্বার্থে রচনা করছে এবং জি এম বীজ এবং রাসায়নিক সার আমদানি করে কৃষিতে ভর্তুকি কমিয়ে দিয়ে কৃষিকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের কথাকে অমান্য করে অবাধ ছাড় দেওয়া সহ নানারকম আইন নামিয়ে আনছে। ১০০ দিনের মধ্যেই মানুষ ধীরে ধীরে বুঝতে পারছে সর্বস্ব লুঠ করার ইউ পি এ আমলের চেয়েও মোদী সরকার শ্রমজীবী জনগণের বিরুদ্ধে আরও আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে যে শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য গড়ে উঠেছে তাকে ভাঙ্গতে সাম্প্রদায়িক কার্ড এলাকা অনুযায়ী ব্যবহার করছে, যা আগামীদিনে প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠবে।

রাজ্যে মমতা সরকারের অবিলম্বে জুট ও চা শিল্পের শ্রমিকদের দাবিপূরণ না করে ধর্ষক-সিণ্ডিকেট মস্তানদের এবং পুলিশরাজের সহযোগিতা করছে। ৩ সেপ্টেম্বর বজবজের ওরিয়েন্ট মোড় থেকে চৌরাস্তা পর্যন্ত দীর্ঘ পথ দুশতাধিক শ্রমজীবী মানুষ মিছিল সংগঠিত করেন। এই মিছিলে নেতৃত্বে ছিল এ আই সি সি টি ইউ-র পক্ষে কিশোর সরকার, লক্ষ্মী অধিকারী, দেবাশিষ মিত্র; বি সি এম এফের পক্ষে বিপ্লব দেবনাথ, স্বপন নস্কর, সুকান্ত দাস; পশ্চিমবঙ্গ গৃহ ও অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের কাজল দত্ত, আশুতোষ মালিক, ইন্দ্রজিৎ দত্ত; শ্রমিক সুরক্ষা মঞ্চের সেখ সাইফুল ও শ্যামল চক্রবর্তী। মিছিলের শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন কিশোর সরকার ও সেখ সাইফুল। বক্তব্যে মোদী সরকারের স্বরূপ উন্মোচনের সাথে সাথে বাংলার চা ও জুট শিল্পের শ্রমিকদের দাবি পূরণ এবং নিউ সেন্ট্রাল জুট মিল শ্রমিকদের ওপর জুলুমবাজি চলছে তা অবিলম্বে বন্ধ করার আবেদন রাখা হয়। নিউ সেন্ট্রাল জুট মিলের ২টি ইউনিট চালু করে সমস্ত শ্রমিকদের কাজ দিতে হবে, বকেয়া বেতন, পুজোর বোনাস প্রদান করতে হবে। কারখানার সম্পদ লুণ্ঠনকারী শ্রমিক ও প্রশাসন বিরোধী, শিল্প বিরোধী বেআইনি মালিককে কারখানার ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়ে রাজ্য সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে।

হাওড়া জেলায় অবস্থান ও প্রতিবাদ সভা

৩ সেপ্টেম্বর মোদী সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ১০০ দিন এই প্রচার কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

৩ সেপ্টেম্বর হাওড়া সংলগ্ন অঞ্চলে এ আই সি সি টি ইউ হাওড়া কমিটির নেতৃত্বে অবস্থান কর্মসূচী সংগঠিত হয়। ব্যানার, প্ল্যাকার্ড ও অন্যান্য প্রচার সামগ্রীতে সভাস্থল ছিল সুসজ্জিত। অর্ধশতাধিক শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন। আশেপাশের বহু দোকান থাকায় আরও মানুষ এই প্রতিবাদী সভার বক্তব্য শুনেছেন। বিগত লোকসভা নির্বাচনের সময় মোদী সরকার ভারতবাসীকে 'সুদিন' এনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ১০০ দিন যেতে না যেতে তা সাধারণ মানুষের কাছে দুর্দিনে পরিণত হয়েছে। এই মোদ্দা বিষয়টা বক্তারা তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তৃণমূল সরকারের সাড়ে তিন বছর জমানায় ধর্ষণ, খুন, তোলাবাজী, সারদার দুর্নীতিতে কিভাবে শাসকদলের ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত নেতা কর্মীবাহিনী আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছে, মূল্যবৃদ্ধি রোধে কেন্দ্র ও রাজ্যের ব্যর্থতা, বন্ধ ও রুগ্ন কলকারখানা খোলা বা পুনর্জীবিত করার বিষয়ে উদাসীনতা। অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিক ও শ্রমজীবীদের প্রতি প্রচণ্ড অবহেলা, বঞ্চনা, হয়রানি চলার বিষয়গুলো বক্তব্যে উঠে আসে। এই কঠিন অবস্থায় পরিবর্তনের জন্য গণতন্ত্র ও নিজেদের ন্যায্য অধিকারের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে জোটবদ্ধ হওয়া ও লড়াইয়ের আহ্বান রাখা হয়।

অবস্থান কর্মসূচী চলে বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। বক্তব্য রাখেন এ আই সি সি টি ইউ জেলা কমিটির সদস্য প্রভাত কুমার, ভোলানাথ চৌধুরী, এ আই সি সি টি ইউ সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি এন এন ব্যানার্জী, জেলা সভাপতি দেবব্রত ভক্ত এবং সম্পাদিকা মীনা পাল এবং ছাত্র নেতা নিলাশীষ। সভা পরিচালনা করেন মীনা পাল।

বিশ্বভারতী ও যাদবপুর ঃ যে প্রশ্নগুলো উঠছে

পাপের বোঝা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের, সিকিম থেকে কলাভবনে পড়তে আসা প্রথম বর্ষের ছাত্রী মিনি দুমাসের অসহ্য মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণার পর কয়েকজন বান্ধবীর সহৃদয় সমর্থনে শেষ পর্যন্ত অভিযোগ জানানোর সাহস অর্জন করে ফেলে।

মিনির গল্প

গ্যাংটকের তাড়ং গ্রাম থেকে দুচোখে স্বপ্ন নিয়ে কলাভবনে ভর্তি হওয়ার কয়েকমাসের মধ্যেই মিনির জীবনে দুঃস্বপ্নের নরকে পর্যবসিত হয় বিশ্বভারতী, প্রথমে ডিপার্টমেন্টের দাদাদের কবলে ও তারপর উপাচার্যের সালিশী সভায়।

৮ জুলাই কলাভবনের তিন সিনিয়ার ছাত্র জোর করে গাড়িতে তুলে কোপাই-এর নির্জনে নিয়ে গিয়ে চড়-ঘুষি মারতে থাকে, যৌন নিগ্রহ করে ও নগ্ন করে ছবি তুলে ছেড়ে দিয়ে যায়, যথারীতি সেই ছবি এস এম এস করে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি সহ। আতঙ্ক গ্রাস করে সদ্য আসা মিনিকে। কলাভবনে, ক্যান্টিনে, রাস্তায় তিন জোড়া চোখ সবসময় ফলো করতে থাকে। টাকা চায় ওরা। কাউকে বলতে না পেরে ভেতরে ভেতরে গুমরে মরে মিনি। আত্মহত্যার কথা ভাবতে থাকে। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। মাঝে একদিন আড়ালে নিয়ে গিয়ে মাথায় এত জোরে ঘুষি মারে যে সাময়িকভাবে অজ্ঞান হয়ে যায় মিনি। সিকিমের গরিব ঘর থেকে আসা মিনি আর টাকা যোগাতে না পারায় একদিন আবার নদীর ধারে নিয়ে যায় ওরা। ভয়ানক পরিণতির ভয় দেখায়। মারধর করে। যৌন নির্যাতন চালায়। অসুস্থ অবস্থায় আবার হাসপাতালে ভর্তি হয় মিনি। এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর কাছে সব ঘটনা খুলে বলে এবার।

কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়। কর্তৃপক্ষ চেষ্টা চালায় মুখ বন্ধ করার। টাকা নিয়ে মিটমাট করে নেওয়ার প্রস্তাব দেন কলাভবনের পরিচালকরা। দুদিন বাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিশাখা কমিটি'কে জানায় তারা। মিনির বাবা এসে পৌঁছালে শুরু হয় নির্যাতনের দ্বিতীয় পর্ব। উপাচার্য সুশান্ত দত্তগুপ্ত ও কলাভবনের অধ্যক্ষ শিশির সাহানা রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিনির বাবাকে বোঝাতে থাকেন যে কিছুই ঘটেনি। বোঝাতে চান যে কিছু ঘটে থাকলে তার দায় মিনির ওপরই বর্তায়। অবশেষে ভেতরের ব্যাপার ভেতরেই রাখতে আদেশ দেন। মেয়ে ও বাবাকে মিডিয়া ও পুলিশের থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে প্রবল চাপ তৈরি করা হয়। নিরন্তর নজরদারিতে রাখা হয় তাঁদের। যত সময় যায় ততই অসহায় বোধ করতে থাকেন বাবা ও মেয়ে। নিরুপায় হয়ে শান্তিনিকেতন ছাড়েন দুজনে। যেতে যেতে মিনির বাবা বলে যান যে হাসিখুশি মেয়েটাকে তারা পাঠিয়েছিলেন বিশ্বভারতীতে, ফেরত নিয়ে যাচ্ছেন এক বিধ্বস্ত কন্যাকে যে বোধহয় আর শান্তিনিকেতনে ফিরে আসবে না।

মিনির বাবার বক্তব্য

উদ্যোগ শুরু হয় ছাত্রদের। পরদিন ৩০ আগস্ট আইসা, ইউ এস ডি এফ ও নর্থ-ইস্ট স্টুডেন্টস ফোরামের ডাকে শতাধিক ছাত্রছাত্রী সেন্ট্রাল অফিসের সামনে জমায়েত হয়। এটা ছিল এক ব্যতিক্রমী ঘটনা, কারণ বিশ্বভারতীতে কর্তৃপক্ষ এক চরম ভীতির পরিবেশ বানিয়ে রেখেছে, ইউনিয়ন ইলেকশন হয় না দীর্ঘদিন। এর আগে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মুখ খোলায় বহিষ্কার করার নজির আছে, তাছাড়া বেশী ট্যাঁ ফুঁ করলেই ফেল করিয়ে দেওয়ার খাঁড়া। তবু পরদিন থেকে জমায়েতে আরও বেশী বেশী ছাত্র যোগ দিতে থাকে। সোশ্যাল নেটওয়ার্কে আলোড়নের ঢেউ সারা দুনিয়া জুড়ে ছুঁয়ে যায় একে অন্যকে। বেরিয়ে আসে এতদিন চাপা থাকা অনাচারের ইতিহাস। কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত এফ আই আর করে। তিন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কিন্তু মিনির বাবা জানান যে ফিরে এসে তিনি বিশ্বভারতীর কর্তাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের করবেন, কারণ তিনি মনে করেন ঐসব কর্তাব্যক্তিদেরও শাস্তি হওয়া প্রয়োজন যারা তাঁকে চুপ করে যাওয়ার জন্য চাপ দিয়েছিল এবং ধর্ষকদের আড়াল করে তাঁর মেয়ের ওপরই দোষ আরোপ করেছিল। সর্বশেষ খবর হল, প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির কাছে ঐ কর্তাব্যক্তিদের শাস্তির আবেদন জানাবেন তিনি।

ধর্ষণ সংস্কৃতি

এর আগে মণিপুরের এক মেয়ে, যিনি এখানে গবেষণা করছিলেন, বিচার না পেয়ে বাড়ি ফিরে যান; নির্যাতনকারী অধ্যাপক সিদ্ধার্থ গুপ্তকে কেবলমাত্র ডীন পদ থেকে অপসারিত করেই ব্যাপারটা ধামাচাপা দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। বছর খানেক আগে এই কলাভবনেরই আরেক ছাত্রী যখন যৌন নির্যাতনের শিকার হন ভবনের অধ্যাপক সুমিতাভ পালের দ্বারা, তখন অধ্যাপকটিকে কেবলমাত্র অন্য ভবনে সরিয়ে দিয়েই সুবিচার সমাপ্ত করেছিল কর্তৃপক্ষ। বিশ্বভারতীতে অধ্যাপকদের ক্ষমতার দাপট অন্য যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে অনেক বেশী। অনেক ছাত্রীই এই দাপটের শিকার হন। মুখ বুজে সয়ে নেয় অনেকেই। যারা শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করে ফেলেন তাদের এখানকার পাট গুটিয়ে চলে যেতে হয়। অধ্যাপকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই চার সিনিয়র ছাত্র পাহাড় থেকে আসা এই নবাগতা ছাত্রীটিকে তাদের শিকার বানায়। এই ছেলেগুলো ভালো করেই জানে যে বেশী কিছু হবে না। তারা জানে স্বয়ং উপাচার্য সুশান্ত দত্তগুপ্তই একজন যৌন নির্যাতনের অপরাধী।

উপাচার্য কীর্তিমান

সত্যেন বোস ন্যাশনাল সেন্টার ফর বেসিক সায়েন্সের ডিরেক্টর থাকাকালীন এই সুশান্ত দত্তগুপ্ত এক গবেষিকার শ্লীলতাহানি করে। ব্যাপারটা একটা স্তরে ধামাচাপা পড়ে যায় ঠিকই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের বিজ্ঞান ও কারিগরিমন্ত্রক তাকে পদ থেকে নিঃশব্দে সরিয়ে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনর্বাসন দেয় এবং তৎকালীন বিজ্ঞান কারিগরি মন্ত্রী কপিল সিবাল পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হয়ে আবার সেই নারী নির্যাতনকারীকেই বিশ্বভারতীর উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ করেন। এরপর এমনকি এই লোক পদ্মশ্রী খেতাবের জন্য মনোনীত হয় যা সরকার বদলানোর পর প্রত্যাহৃত হয়। ২০১২-র পৌষমেলায় বিশ্বভারতীর প্রাক্তনীরা তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ দেখায়, অভিযোগ—দুর্ব্যবহার, বেআইনিভাবে বেতন ও পেনশন একসাথে ভোগ করা, দিল্লী সফরে গিয়ে যত্রতত্র মদ্যপান এবং বিশ্ববিদ্যালয় তহবিল থেকে তার বিল মেটানো ইত্যাদি। এই মর্মে দুটি জনস্বার্থ মামলাও চলছে তার বিরুদ্ধে। গত পৌষ মেলায় এই লোক বাউল ফকিরদের আখড়ায় ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বসিয়েছিল কে ওখানে গিয়ে কি করে তা দেখার জন্য।

ধর্ষণ সংস্কৃতি

দুনিয়া জুড়ে ছিছিক্কার ধিক্কারের ফলে এবং সর্বোপরি বহু বছর অরাজনীতি আর রেজাল্ট খারাপ করিয়ে দেওয়ার দাওয়াই দিয়ে ঠাণ্ডা করে রাখা ছাত্রদের দ্রুত সক্রিয় ও সংগঠিত হয়ে উঠতে দেখে চাপ খেয়ে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত এফ আই আর করে। কিন্তু ধর্ষণ-সংস্কৃতি থেকে তারা এক চুলও সরে আসেনি, মানসিকতা তাদের বিন্দুমাত্রও বদলায়নি। ধূর্ত কর্তৃপক্ষ এখন ছাত্রদের ওপর আরও একধাপ আক্রমণ শানাচ্ছে। এর আগে কিছু ছাত্রী যে বিচার না পেয়ে বিশ্বভারতী ছেড়ে চলে গিয়েছিল সেই যাওয়াটাও ছিল একরকম প্রতিবাদ। তাদের সহপাঠিরা তখন ভয়ে মুখ খোলোনি প্রকাশ্যে, তবু এক চাপা গুঞ্জন আকারে বেঁচে ছিল প্রতিবাদ। মিনির ক্ষেত্রে সেখানেই আটকে নেই, এবার সাধারণ ছাত্ররা খোলাখুলি তার প্রতিবাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ফলত মেয়েদের ওপর যে এজমালি আধিপত্য কায়েম রেখেছে ক্ষমতাশালী অধ্যাপক ও তাদের স্যাঙাত চক্র তা ধাক্কা খেতে পারে, আর সেই কারণেই বিশ্বভারতী ছাত্র কল্যাণের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক নয়া বিধিনিষেধ চালু করতে চলেছে ছাত্রীদের জন্য। জানানো হয়েছে যে, সন্ধ্যার পর ছাত্রীরা আর বাইরে ঘোরাফেরা করতে পারবে না।

এই সংস্কৃতি নারীর যৌনতা ও স্বাধীন অভিব্যক্তির ওপর ছল, বল ও কৌশলে পুরুষের সমষ্টিগত আধিপত্য কায়েম রাখতে চায় যা চলতি শোষণ-ব্যবস্থা পুনরুৎপাদনের নিরন্তর শর্ত প্রস্তুত করে। শেকড় বাকড় এইখান থেকে ঢুকে পড়ে যাদবপুরের গল্পে। যাদবপুরেও গেটে গেটে সি সি টি ভি, সাম্প্রতিক ছাত্রী নিগ্রহের পর 'নিরাপত্তা' বাড়াতে নরজদারী আরও জোরদার করা হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

যাদবপুরের গল্প

যখন সরকারি ক্ষমতাসীন ব্যক্তি, প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতা, সমাজের গণ্যমান্যরা বা প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা ধর্ষককে আড়াল করে 'ছোট ঘটনা', 'চক্রান্ত' বা 'সাজানো ঘটনা' বলে; যখন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমনের হাতিয়ার হয় বিরোধী নারীদের ধর্ষণ বা ধর্ষণের হুমকি, যখন রাষ্ট্র তার সেনা বাহিনীকে ধর্ষণের ছাড়পত্র দিয়ে ইনসার্জেন্সি দমন করতে পাঠায় তখন আমরা মোটা দাগে বিষয়টা চিনতে পারি ও প্রতিবাদ করি। কিন্তু অন্য প্রশ্নে তুলনামূলক প্রগতিশীল ভূমিকা রাখা যাদবপুরের ছাত্র ইউনিয়ন ও সংগঠনগুলোও যখন আক্রান্ত মেয়েটির পাশে দৃঢ়তার সাথ দাঁড়াতে চরম দোদুল্যমানতা দেখায় তখন সেই সংস্কৃতির শেকড় নিজেদের এই প্রগতিশীল শিবিরের অন্দরেও খুঁজতে-বুঝতে হয় বৈকি।

এটা হচ্ছে সেই গৌহাটির ক্লাসিক কেসটার মতো, যেখানে একদল তরতাজা যুবক সংবাদ ক্যামেরার সামনে গর্বভরে এক যুবতীকে নিগ্রহ করেছিল, কারণ তারা রাত্রি দশটায় একাকী এক যুবতীকে পানশালা থেকে বেরোতে দেখে তাকে সবক শেখানো সামাজিক কর্তব্য বলে মনে করেছিল। যাদবপুরের দশটি ছেলেও ঐ 'নীতিবড়দা'র বা নীতি-গার্জেনের ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হয় যখন উৎসব সন্ধ্যায় মেয়েটিকে তারা নাকি 'বহিরাগত' বন্ধুর সাথে 'আপত্তিজনক' অবস্থায় দেখতে পায়। এই সবক শেখানোর সামাজিক কর্তব্যটি সম্পন্ন হয় হস্টেল সুপারের চোখের সামনেই (যিনি পরে জানিয়েছেন যে হস্তক্ষেপ করলে তাকেই মার খেতে হত!)। যাদবপুরের উপাচার্য দুপক্ষকে মিটমাট করে নেওয়ার পরামর্শ দেন। অর্থাৎ উপাচার্য নিজেও এই কাজকে অপরাধ হিসাবে দেখেন না, কিংবা উভয়পক্ষকেই সমান অপরাধী হিসাবে দেখেন। আর আক্রান্ত মেয়েটিকেই কার্যত বহিষ্কারের নির্দেশ দেন, দুসপ্তাহ ক্যাম্পাসে আসতে নিষেধ করা হয় তাকে। বিষয়টি নিয়ে হইচই শুরু হওয়ার পর ক্যাম্পাসে ছাত্রদের এক সাধারণ সভায় প্রায় শ'দেড়েক ছাত্রের উপস্থিতিতে অপরাধীদের কয়েকজন উপস্থিত হয়ে বুক ফুলিয়ে বলে যে তারা যা করেছে বেশ করেছে, প্রয়োজনে আবার করবে। ঐ ছেলেগুলোকে তো বটেই, এমনকি অনেক সাধারণ ছাত্রকেই সহজে বোঝানো যাবে না যে ওটা অপরাধ। মেয়েটির সম্পর্কেই চলতে থাকে ফিসফিসানি প্রচার—অশ্লীল কাজকর্ম করছিল, মদ খায়, দলীয় চক্রান্ত ইত্যাদি। কারিগরি বিভাগের ছাত্র সংসদ ফেটসু, যারা ক্যাম্পাসের বিভিন্ন আন্দোলনে নেতৃত্বের প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে তারা যে শুধু নীরব থাকে তাই নয় তাদের নেতারা ভেতরে ভেতরে এই নীতি-গার্জেনগিরিকেই সমর্থন জানায়। হস্টেলে সাধারণ সভা ডেকে তাদের নেতারা যে সিদ্ধান্ত পাশ করায় তা হল 'এটা যদি অপরাধ হয় তাহলে হস্টেলের সবাই আমরা অপরাধী', যদিও এই সভায় অল্প কয়েকজনই উপস্থিত ছিল। ক্যাম্পাসের যে সংগঠনগুলো অন্যত্র ঘটে চলা নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকে তারাও প্রাথমিকভাবে চরম দুর্বলতা দেখায়।

এসব পড়ে পাঠকগণ একটু অবাক হচ্ছেন বোধ হয়! ভাবছেন ছি ছি যাদবপুরেও এই! কিন্তু খুব কি অচেনা বিষয়? ধর্ষক বা নারী নির্যাতনকারীকে কি সব সময় 'বাইরের কেউ' হিসাবে ভেবেই নৈতিক প্রশান্তি লাভ করতে চাই না আমরা? আর, নিজেদের প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে যখন অভিযোগ ওঠে তখন ভাবি—আহা! ও কি এটা করতে পারে? ভাবি যে ভেতরে অন্য গল্প আছে, হাওয়ায় ভাসতে থাকে মেয়েটি সম্পর্কেই বিভিন্ন প্রশ্ন। এসব ক্ষেত্রে একইরকম ধ্যানধারণার ফিসফিসানি কি আমরা শুনিনা? মলেস্টেশনের কারণ হিসাবে কি 'উদার পরিবেশ'কেই দোষারোপ করে ফেলি না? উত্থাপিত 'অস্বস্তিকর' নারী-প্রশ্ন এড়াতে রেপ-কালচারকে ঢেকে দিয়ে মনগড়া 'নেশা-কালচার'-এর বিরুদ্ধে ছায়াযুদ্ধকেই পলিটিক্যাল প্রায়োরিটি বানিয়ে ফেলি না?

লড়াইটা তাই নিজেদের সাথেও

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্তকারী দলের তিন অধ্যাপিকা অভিযোগকারী ছাত্রীটির বাড়িতে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে মেয়েটিকে সেই প্রশ্নগুলোই করেছে যা মলেস্টার গ্যাং ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গোরা তুলে থাকে। মদ খাও/খেয়েছিলে কি না, কি পোষাক পরেছিলে, কেন ঐ আধো অন্ধকার জায়গায় গেছিলে—এইসব। মেয়েটির বাবা এদের বিরুদ্ধেও থানায় ডায়েরি করেছেন। এঁদের মধ্যে একজন মহিলা নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবি চর্চা (উইমেন স্টাডিজ) বিভাগের অধ্যাপিকা। মনে পড়ে ২০০২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মলেস্টেশনের অভিযোগের প্রায় দেড় মাস বাদে চাপে পড়ে তৈরি হওয়া তদন্ত কমিটির মহিলা অধ্যাপকরা প্রথম বর্ষের অভিযোগকারী ছাত্রীটিকে প্রায় একইরকম ইঙ্গিতমূলক প্রশ্ন করেছিল, প্রিয় কবি কারা তা শুনে তদন্তকারীরা বলেছিল—"ও! শরীর কেন্দ্রীক কবিতা পড়তেই তোমার ভালো লাগে!!" এঁদের কেউ কেউ ছিলেন স্বয়ং নারী আন্দোলনের তাত্ত্বিক। অনেক লড়েও মেয়েটি সেদিন বিচার পায়নি, পড়াশুনা চৌপাট হয়ে গেছিল তার। সেদিনও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ইউনিয়ন মেয়েটির পাশে দাঁড়ায়নি, তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনটি প্রকাশ্যে হোর্ডিং লিখেছিল—'চম্পলা সর্দার উপাখ্যান' এবং তদন্ত শেষে কর্তৃপক্ষ রায় দিয়েছিল—"এরর অব জাজমেন্ট, নট এনি কগনিজেবল অফেন্স"। বিদ্যমান রাজনৈতিক ক্ষমতাতন্ত্রে নিজেদের চেয়ার ধরে রাখতেই কি তারা বিসর্জন দিয়েছিল নিজেদেরই ঘোষিত ও প্রচারিত বোধ-বুদ্ধি-চেতনা?

শেষে যে আশার কথা শোনানোটা দস্তুর

বিলম্বে হলেও ক্যাম্পাসের ছাত্র সংগঠনগুলোর কয়েকটি এটাকে অপরাধ হিসাবেই দেখছে বলে বিবৃতি দিয়েছে, অপরাধীর শাস্তি চেয়েছে, নীতি-গার্জেনগিরির বিরোধিতা করেছে। কালপ্রিটদের গ্রেপ্তারের দাবি তুলেছে কেউ কেউ। কিন্তু সমালোচনার মুখে পড়ে অবস্থান ঘোষণা করে দায়মুক্ত হওয়াতে আটকে থাকলেই বিপদ। কর্তৃপক্ষ কেন লিঙ্গ সচেতনতা তৈরি করেনি—এটুকু বলে দায় এড়াতেও পারি না আমরা। কারণ, লড়াইটা

পাঁচের পাতায় দেখুন

প্রমাণ করুন 'সততার প্রতীক'

'ক'-এ কান, 'ম'-এ মাথা। 'ক'-এ কুণাল, 'ম'-এ মদন-মুকুল-মমতা। হায়! অদৃষ্টের কী পরিহাস' 'পরিবর্তন' নিয়ে আসার স্বঘোষিত ঠিকেদারদের। বেশ চলছিল ডুবে ডুবে সারদা মধুর ভাগ নেওয়া। কোথা থেকে যে ঝড় উঠে গেল। সারদা প্রতারণার পর্দা ফাঁস শুরু হয়ে গেল। আছড়ে পড়ল প্রতারিত লক্ষ লক্ষ আমানতকারিদের বিক্ষোভ। সেই ঝড় সামাল দিতে এবং যাতে এই আমল নিয়ে প্রশ্ন না উঠতে পারে, নেওয়া হল দ্বিমুখী চালবাজী। একদিকে সারদাকাণ্ডকে থানা-পুলিশ-আইন-আদালতের গড্ডালিকা প্রবাহে ফেলে রাখা, অন্যদিকে ক্ষতিপূরণের ৫০০ কোটি টাকার ঝোলা খোলা। কিন্তু এতেও ঝড় থামল না। বরং বাড়তেই থাকল, সারদাকাণ্ডের তদন্তে হেস্তনেস্ত চাই! তৃণমূল আমলে সারদার এতো বাড় বাড়লো কি করে? পরিস্থিতি গড়াতে লাগল তৃণমূলের প্রতিকূলে। তৃণমূলী কিছু কিছু জনপ্রতিনিধি ও রাজ্যসভার সাংসদদের নাম উঠতে লাগল সারদার লেনাদেনার সহচর হিসেবে। প্রকাশ্যে দলের যাতে মুখ না পোড়ে, সেইমতো সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা নেওয়া হল। তখনও তদন্ত সি আই ডি-র হাতে। বলি দেওয়া হল প্রথম চিহ্নিত চোর রাজ্যসভার সাংসদটিকে। চাপের মুখে অভিযুক্ত কুণালও গ্রেপ্তারী গিলল আধা আশ্বাস পেয়ে আধা ব্ল্যাকমেইলিং-এর ভয়ে। তার আগে সারদাকেও একইভাবে হেফাজতে ঢোকানোয় রাজী করানো হয়।

পরিস্থিতি চলতে চলতে হতে থাকলো উত্তপ্ত, ঘনিয়ে এল লোকসভা নির্বাচনও। ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনের মতোই ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনেও তৃণমূলনেত্রীকে তুলে ধরা হয়েছিল প্রশ্নাতীত 'সততার প্রতীক'। লোকসভা নির্বাচনী রায়ে তৃণমূলের সাংসদ সংখ্যা অনেক বাড়লো। কিন্তু সারদাকাণ্ডের তদন্তের দাবি এতটুকু স্তিমিত হল না, বরং আরও তীব্র হতে লাগলো। সি আই ডি-র তদন্তের 'নিরপেক্ষতা' নিয়েও প্রশ্ন জোরদার হল। কেন্দ্রে তারপর জমানা বদল হল। আর সারদা তদন্তও প্রবল চাপের তোড়ে গেল সি বি আই-এর হাতে।

সি বি আই যে কেন্দ্রের পক্ষপাতিত্বে পরিচালিত হয়, তার সেই 'তোতা ভূমিকা' নিয়ে আদালতী ভর্ৎসনাও রয়েছে। তবু সারদাকাণ্ডে সি বি আই তদন্তের দাবি উঠেছে নিচের থেকে এবং সি আই ডি-র পক্ষপাতমূলক তদন্তের পরিবর্তন চেয়ে, বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে, আর এখনাবধি সি বি আই তদন্তের মধ্যে রাজ্যের শাসকদলের প্রতি অহেতুক রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার কোন তথ্য নেই। যা ঘটছে সেটা হল, কান টানলে মাথা আসছে। এক কুণালের কান টানতেই মাথারা আসছে সন্দেহের গুঞ্জনের তালিকায়—মদন-মুকুল-মমতা। কুণালের ওঠানো আঙ্গুল বলতে চায় যেন, তুমি মহানেত্রী 'সততার প্রতীক' আর কেবল আমি আজ চোর বটে। এখন আর 'মা-মাটি-মানুষের' নেত্রী নাম কেনার উপায় হচ্ছে না। এখন তিনি যে সন্দেহবশত মদনে মুকুলিত মমতা। পেছনে ছাপ্পা এখন সারদার পুতিগন্ধময় কাদা।

সি বি আই তদন্ত এখনও কোটি কোটি টাকার হদিশ করে উঠতে পারেনি। সি বি আই সূত্রে সংবাদজগতে খবর ভাসছে, সারদা কেলেংকাবির অর্থের পরিমাণ নাকি ১০ হাজার কোটি টাকা! সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, তদন্তের জাল গুটিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ধরা পড়েছে বেশ কিছু অভিযুক্ত, তৃণমূলের এক চাঁই প্রথম ধরা পড়ল, রজত মজুমদার । সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, সন্দেহের সবচেয়ে বড় রাঘববোয়ালরা জালে ধরা পড়বে কী?

গলগল করে বেনো তথ্য বের হচ্ছে। ২০১১-১২-তে মোট ২৩৯৫টি ক্লাবকে কয়েক খেপে গড়ে ২ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছিল। কেবলমাত্র তৃণমূলনেত্রীর নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে টাকা বিলোনো হয়েছিল ২৭টি ক্লাবে। শুধু তাই নয়, টাকা পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল একগাদা শারদোৎসব কমিটিকে। টাকা ঢালানো হয়েছে রেলে তৃণমূলনেত্রী রেলমন্ত্রী থাকার সময় পিপিপি মডেলে তথাকথিত বিলাসবহুল 'ভারততীর্থ' পর্যটন চালু করতে। মুকুল দাবি করেছেন ঐ চুক্তি তাঁর বা দীনেশ ত্রিবেদীর সময়ে হয়নি। আর আর সি সি টি বিবৃতি দিয়েছে ওটা হয়েছিল তৃণমূলনেত্রী রেলমন্ত্রী থাকাকালীন। সারদার টাকা মিডিয়ায় ব্যাপক পরিমাণে খাটানোর জন্য নীলনকশা তৈরী হয়েছিল। বৈঠক হয়েছে মমতাদেবীর একাধিক উপস্থিতিতে, আগ্রহে, জোরাজুরিতে। বৈঠক হয়েছে কলকাতা, কালিম্পং, দিল্লীতে। তৃণমূলকে দিল্লীতে রিমোটে চালানোর ভবিষ্যৎ শাসকদল আর তৃণমূলনেত্রীকে ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তুলে ধরার জন্য। রাজনৈতিক লোভের তাগিদে গোপনে সারদার সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উঠতে গিয়ে হড়কে পড়ে তৃণমূলের এখন রাজনৈতিকভাবে হাত-মুখ-পা ভাঙ্গা দুরাবস্থা। কিছু কিছু সংবাদপত্র ও চ্যানেলকে জোর প্রমোট করার ওকালতি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ প্রকাশ হচ্ছে ঐসব প্রকাশনা ও ব্যবসার পেছনে লগ্নী করানো হয়েছিল সারদার টাকা। মুখ্যমন্ত্রীর হাতে আঁকা ছবির সবচেয়ে বড় অপ্রকাশ্য ক্রেতা ছিল সারদামালিক। প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, সায়েন্স অডিটোরিয়াম থেকে নেতাজী ইণ্ডোর স্টেডিয়াম—কত যে আয়োজিত হয়েছিল ব্যয়বহুল গুণীজন সম্বর্ধনার আসর! ওসবে লেগে নেই তো সারদার কলঙ্ক! তথ্য মিলছে, তৃণমূলের কাগজ 'জাগো বাংলা' বের হত সারদার টাকায়! কলকাতা বইমেলায় 'জাগো বাংলা'র কোটি টাকার স্টল সারদার টাকায়! আমানতকারীদের মেরে দেওয়া টাকা স্পনসর হিসেবে নিয়েছে তৃণমূল। রাজ্য সরকারের কোষাগারের মোচ্ছবের খাঁই মেটাতে বাজার থেকে যে টাকা জোগাড় করা হত সেও কি সারদার টাকা!

সারদাকাণ্ডে জড়িত ক্ষমতাশালীদের নেটওয়ার্ক বিস্তার হয়ে রয়েছে এরাজ্য সমেত আরও তিন-চারটি রাজ্যে। সন্দেহের তালিকায় রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রী, ব্যবসায়ী, ক্লাব কর্তা, প্রাক্তন পুলিশ অফিসার এবং এমনকি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, সেবির কিছু আমলা-অফিসারও। তবে সন্দেহের কেন্দ্রমুখ নিঃসন্দেহে রাজ্যের শাসকদলের কেষ্টবিষ্টুদের দিকেই। এরাই ছিলেন সারদার সবচেয়ে জোরের জায়গা, আর এদের বিরুদ্ধেই চোরের ওপর বাটপারীর সবচেয়ে বড় অপরাধের অভিযোগ।

এই কল্পনাতীত পরিস্থিতি তৃণমূল কীভাবে সামাল দেবে বুঝে উঠতে পারছে না। তথ্য চাপতে গিয়ে আরও বেফাঁস হচ্ছে কীর্তিকলাপ। মুখ্যমন্ত্রীর যার ডাঁয়া-বাঁয়া, তাদের ডাঁয়া-বাঁয়াদের সি বি আই তলব ও জেরা করতে শুরু করেছে। যে সব সম্পাদক তৃণমূলনেত্রীর কলকাঠিতে কঙ্কে পাচ্ছিলেন তাদেরও জেরায় ডাক পড়তে শুরু করেছে। ভাবমূর্তি তৈরীতে আকাশচুম্বী হতে একদা তৃণমূলনেত্রী সবচেয়ে বেশী ভরসা করেছিলেন যার ওপর সেই মিডিয়াকেই এখন তাদের সবচেয়ে বেশী ভয়। মদন-মুকুলের মুখ পোড়া। যা ডুবিয়েছে আর নির্ভরযোগ্য মনে হচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও মুখোমুখি হতে চাইছেন না। ববি হাকিম মার্কা সংখ্যালঘু ফাটকা তাসও সুবিধার হচ্ছে না। হাকিমের মাফিয়া মুখ কদাকার বন্দর দুর্নীতি-তোলাবাজীতে। অতীতে নেত্রীকে উৎরে দিয়েছেন যে মেন্টর দাদা পঞ্চায়েতমন্ত্রী সংকট মোচনের যে বিবৃতি অবশেষে দিতে শুরু করলেন তাতে গাদ আছে সার নেই। অগত্যা মিডিয়ার সামনে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে এখন শিক্ষামন্ত্রী আর সংসদীয় দলনেতাকে। কিন্তু কুণালের কথা হল, ওরা দুজনেও সারদা মালিক আর মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লীর গোপন পরিকল্পনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এরপর আর তাদের মুখ্যমন্ত্রীকে আড়াল করার বক্তব্যের মর্যাদা কি থাকতে পারে? তৃণমূলের সংসদীয় দলনেতা বলছেন, সাংসদদের দলবল নিয়ে দিল্লী যাবেন। প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নালিশ বা অনুরোধ করতে। সি বি আই তদন্ত যেন রাজ্যের শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক না হয়। গোটা তৃণমূল নেতৃত্বের সুর রক্ষণাত্মক। মুখ্যমন্ত্রী এখন কি রক্ষাকবচ দেখছেন একমাত্র তৃণমূল যুবা সভাপতি ভাইপোর মধ্যে! দলের সুপ্রীমো মায় সুবেদাররা সব পিছনে, আর সামনে এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে এক নবীন সাংসদ নাবালককে, যার মুখে 'পিসির দল'কে বাঁচানোর কথা ছাড়া আর কোন বাক্য আসার সাবালকত্বই নেই।

হেফাজতে বন্দী বরখাস্ত সাংসদ মুখোমুখী জেরায় বসার সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীকে। মুখ্যমন্ত্রী যদি দাবি রাখেন তিনি 'সততার প্রতীক', তাহলে মুখোমুখি বসতে ভয় পাচ্ছেন কেন? সি বি আই এখনও না ডাকলেও তিনি আগ বাড়িয়ে চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন না কেন? মিডিয়ার মুখোমুখি হচ্ছেন না কেন? এইসব কেন-র প্রশ্ন তৃণমূলকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। নেতৃত্বের পিঠ ক্রমশ ঠেকছে দেওয়ালে।

তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর তাঁকে সামনে রেখে অনেক 'পরিবর্তনপন্থী' অনেক আশার কথা বলেছেন। 'সুবোধ বুদ্ধিজীবী'র মতন এই সেদিনও কেউ কেউ তৃণমূলী আনুগত্যে অবগাহনের 'বাম সাহস' দেখাতে শুরু করলেন। কিন্তু সারদাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ-বাণ যখন ধেয়ে আসছে তখন তারা কি ভাবছেন? এক স্বনামধন্য অভিনেত্রী একবার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন, সুযোগ পেলে নাট্যমঞ্চে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনচরিত ফুটিয়ে তোলার চ্যালেঞ্জ নিতে রাজী, কেবল চেহারায় কিছু সাদৃশ্য রয়েছে বলে নয়, চরিত্রের প্রতি আকর্ষণে। সেই অভিনেত্রী এখন সারদা-তৃণমূল আঁতাতের গোপন অভিসার প্রকাশ হয়ে পড়া দেখতে দেখতে মনে হয় বুঝতে পারছেন রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে তৃণমূলনেত্রীর তুলনা একমাত্র তিনিই। নেত্রী হিসেবে যেমন, 'অভিনেত্রী' হিসেবেও। তিনিই তাঁর অদ্বিতীয়া।

তবু মুখ্যমন্ত্রী মমতা নিজেকে যদি 'সততার প্রতীক' দাবি করেন, তাহলে সারদাকাণ্ডে জড়িত থাকার প্রশ্নে নিজেদের নিষ্কলঙ্ক প্রমাণ করুন।

- অনিমেষ চক্রবর্তী

বিশ্বভারতী ও যাদবপুর ...

চারের পাতার পর

অনেকটা যেন নিজেদের সাথেই। হস্টেলের ছাত্ররা অনেক গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে সামনে থেকে লড়েছে, কয়েকটি ছাত্রের কার্যকলাপকে হস্টেলের সমস্ত আবাসিকদের ঘাড়ে চাপাতে দেওয়া যায় না। অন্যদিকে সামগ্রিকভাবেই ক্যাম্পাসে যে নীতি-গার্জেনগিরির পরিবেশ/ধারণা/মানসিকতা আছে তা হস্টেলের কম্যুনিটি ফিলিংসের সাথে যুক্ত হয়ে মারাত্মক আকার নিচ্ছে। এর আগে (গত র‍্যাগিং আন্দোলনের সময়) এই ফিলিংস এক আত্ম-অবমাননাকর অন্ধগলিতে ঠেলে দিয়ে ক্যাম্পাসের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চেতনাকে মারাত্মকভাবে ড্যামেজ করেছিল। বর্তমান ক্ষেত্রে সংগঠনগুলোকে দৃঢ়তার সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নীতি-গার্জেনগিরির বিরুদ্ধে 'জেণ্ডার সেন্সিটিভিটি' ক্যাম্পেন গড়ে তুলে অপরাধী গ্রুপটিকে বিচ্ছিন্ন করা এবং তাদের শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য ও কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত নারী-বিরোধী ভূমিকার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা একান্ত জরুরী এবং সম্ভব বলে মনে হয়। এটা না করতে পারলে আগামী দিনে কর্তৃপক্ষ ও শাসকদলের পোয়া বারো, এ রাজ্যের 'সাজানো ঘটনা' আর 'ছেলে পাঠিয়ে রেপ করিয়ে দেব' ধারার সাথে যাদবপুরের প্রতিস্পর্ধী ধারার ফারাকটা ক্ষয়ে যেতে বেশী সময় লাগবে না। অন্যদিকে, বিশ্বের তরুণ সমাজের সামাজিক-রাজনৈতিক গতিময়তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক প্রান্তে ফেলে রাখা 'কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়' বিশ্বভারতীর ছাত্রেরা দীর্ঘ দিনের অচলায়তন ভাঙ্গতে শুরু করেছে। প্রত্যেক ভবনে 'জেণ্ডার সেল' নির্বাচনের দাবি আদায় করেছে, কর্তৃপক্ষের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে আলাদা তদন্ত কমিশন গঠনের দাবিও তুলেছে, এ যাবত বন্ধ রাখা স্টুডেন্টস ফ্যাকাল্টি কমিটিগুলোর নির্বাচনের কথাবার্তা শুরু হয়েছে। সর্বোপরি আমাদের মধ্যে এই সবকিছু নিয়ে চর্চা খানিক বাড়ছে।

- মলয় তেওয়ারি

রাজ্যপালের কাছে নারী স্বাধিকার সমন্বয়ের ডেপুটেশন

নারী স্বাধিকার সমন্বয়ের পক্ষ থেকে ৩ সেপ্টেম্বর রাজ্যপালের কাছে একগুচ্ছ দাবি সমেত স্মারকলিপি দেওয়া হয়। মূল বক্তব্য ছিল, পশ্চিমবাংলায় সরকার ও প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে নীচুতলা পর্যন্ত নারী বিরোধী মনোভাবের জন্য মেয়েদের নিরাপত্তা ও অধিকারগুলো খর্ব হচ্ছে; সুতরাং রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন। কাঁথির সুনিয়া, কামদুনি, মধ্যমগ্রাম, ধূপগুড়ির মর্মান্তিক ঘটনা উল্লেখ করে বলা হয়, অপরাধীদের শাসকদল আড়াল করার চেষ্টা করছে। ফলে এরা উপযুক্ত শাস্তি পাচ্ছে না। পুলিশ নিষ্ক্রীয় থাকছে, সহজে এফ আই আর নিতে চাইছে না। বরং আন্দোলনকারীদের অ্যারেস্ট করে কেস দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া আলোচনায় রাখা হয় কর্মস্থলে, বিশ্বভারতী ও যাদবপুরের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েরা নিরাপত্তা পাচ্ছেন না। এ রাজ্যে বিচারের নামে সালিশী সভা বেড়ে চলেছে শাসক দলের মদতে। ফলে মেয়েদের ওপর হিংসা আরও বাড়ছে। অবিলম্বে এসব বন্ধ করার দাবি জানানো হয়।

রাজ্যপাল প্রতিনিধিদের অভিযোগগুলো মন দিয়ে শোনেন, আলোচনায় অংশ নেন এবং নোট করেন। প্রতিশ্রুতি দেন সমস্ত ঘটনার রিপোর্ট ডিজি-র কাছ থেকে জানতে চাইবেন এবং এ বিষয়ে আমাদের জানাবেন।

প্রতিনিধিদলে ছিলেন গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির মালিনী ভট্টাচার্য, মিনতি ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির শ্যামশ্রী দাস, সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতির চৈতালী সেন, নেহাই সংগঠনের বর্ণালী মুখার্জী, আইনজীবী ভারতী মুৎসুদ্দি, আই সি ডি এস সংগঠনের প্রতিনিধি সহ মোট ১০ জন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিগ্রহ ...

একের পাতার পর

দোষীদের শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত এবং দীর্ঘমেয়াদীভাবে ক্যাম্পাসে ছাত্রীদের নির্ভয় স্বাধীনতার দাবিতে শেষ পর্যন্ত লড়বে। সেদিনের প্রতিনিধিদলে ছিলেন ইন্দ্রাণী দত্ত, কস্তুরী, মিতালী (মিঠু), মমতা ঘোষ, মলিনা বক্সী, শীলা দে সরকার, স্বপ্না চক্রবর্তী, অরুমিতা, সুধন্যা, ইপ্সিতা, শ্রীজা এবং যাদবপুরের আরও কিছু আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রী। স্মারকলিপির পূর্ণাঙ্গ প্রতিলিপি আইপোয়ার পাতায় পাওয়া যাবে।

http://www.facebook.com/AIPWABengal/posts/373292146154136

বিদেশে মোদী বক্তব্য রাখছেন সাম্প্রদায়িক ভাষায়, আর দেশের মাটিতে রাজনাথ তীব্র করছেন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস

মোদী সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং রাজস্থান পুলিশ অ্যাকাডেমিতে তাঁর ভাষণে পুলিশ কর্মীদের একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আর সেটা হল, তিনি যখন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি সেখানকার পুলিশ কর্মীদের এই নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যে, তারা 'মাওবাদীদের মোকাবিলা ও তাদের নিকেশ' করতে পারে এবং তার জন্য তাদের কোন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে না। কেননা, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সেখানকার পুলিশ অফিসারদের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের (এন এইচ আর সি) মুখোমুখি হওয়া থেকে তিনি রক্ষা করবেন! রাজস্থানের পুলিশ কর্মীদের তিনি আশ্বস্ত করলেন—দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে এখন তিনি সেই একই কাজ করবেন। মানবাধিকার কমিশন যে প্রশ্নগুলো তুলেছে সেগুলোকে তিনি পুলিশদের 'হেনস্থা' বলে বর্ণনা করেন।

দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে তিনি যদি 'মানবাধিকার' ও নাগরিক অধিকারকে ছোটখাটো অসুবিধা ও বাধা বলে বর্ণনা করেন তাহলে তিনি পুলিশদের হত্যা ও গণহত্যা সংঘটিত করার আহ্বান প্রকাশ্যেই জানাচ্ছেন। নাগরিক স্বাধীনতা ও অধিকার সংবিধানে বিধিবদ্ধ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রকাশ্যেই সংবিধানের অবমাননা করছেন এবং তিনি ন্যক্কারজনকভাবে তা করছেন 'দেশকে রক্ষা করার' নামে!

পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে 'মাওবাদী' হল একটা সংকেতলিপি যা দিয়ে তারা 'আদিবাসী' ও দলিতদের বোঝায়। রাজনাথ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়কে একটা মডেল হিসেবে বর্ণনা করছেন, আর সেই মডেল কিরকম ছিল আমরা একটু স্মরণ করি। রাজনাথ সিং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় ২০০১-এর ৯ মার্চ উত্তরপ্রদেশের পুলিশ পূর্ব উত্তরপ্রদেশের ভবানিপুরের মাদিহানে ১৬ জন মানুষকে গুলি করে হত্যা করে, যাদের অধিকাংশই ছিল কৃষি মজুর এবং দুজন স্কুল ছাত্র এবং নিহতদের সবাই ছিল দলিত ও আদিবাসী। দুজন স্কুল ছাত্রের মধ্যে একজন পড়ত অষ্টম শ্রেণীতে, অন্যজন নবম শ্রেণীতে। ঐ গণহত্যাকে মাওবাদীদের সঙ্গে 'সংঘর্ষ' বলে দাবি করা হয়। কিন্তু আসল ঘটনাটা হল, এক গ্রামবাসীর ছেলের *গহনা* অনুষ্ঠানে ভোজের পর মাদিহানের গ্রামবাসীরা ঘুমোচ্ছিলেন।

একইভাবে ছত্তিশগড়েও নিরাপত্তা বাহিনী ফসল কাটার বিজু পাণ্ডাম উৎসবে সমবেত আদিবাসীদের প্রায়শই হত্যা করে। বস্তারে ২০১২ সালে কোট্টাগুডা-রাজপেন্টা-সারমেগুভীর গণহত্যাও ছিল ঐ ধরনেরই এক গণহত্যা যাতে সি আর পি এফ ১৭ জন মানুষকে গুলি করে হত্যা করে, যাদের মধ্যে ১০ বছরের একটি ছেলে ও ১২ বছরের একটি মেয়ে সহ ৭ জন শিশুও ছিল।

মানবাধিকার কমিশনের কাছে জবাবদিহির থেকে মুখ্যমন্ত্রীরা এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরা তাদের রক্ষা করতে পারবেন, এই আশ্বাস পেয়ে পুলিশরা হেফাজতে ধর্ষণ ও হত্যা করে ঃ এবং তাদের শুধু বলি হওয়া মানুষদের 'মাওবাদী' বা 'নকশালপন্থী' বলে ঘোষণা করলেই চলে। বস্তারের বর্তমান আই জি এস আর কাল্লুরি হেফাজতে লেধা বাই-কে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত, আর অন্য এক উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার অঙ্কিত গর্গ পুলিশি হেফাজতে সোনি সোরিকে ধর্ষণ করেন।

ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টোকিওতে এমন ভাষায় কথা বলেছেন যার থেকে মনে হয় তিনি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বদলে তাঁর স্বপ্নের হিন্দু রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, জাপানের সম্রাট আকিহিতোকে ভগবত গীতা উপহার দেওয়া নিয়ে ''ধর্মনিরপেক্ষ বন্ধুরা'' অকারণে শোরগোল তুলবেন এবং টিভিতে বিতর্ক চালাবেন। ঐ মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে তিনি গীতাকে ভারতের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক তিহ্য হওয়ার বদলে শুধুমাত্র হিন্দুদের সম্পদ রূপেই চিহ্নিত করলেন। উপহার হিসেবে গীতাকে বেছে নেওয়া এবং সর্বোপরি তাঁর মন্তব্য ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি এক সুপরিকল্পিত অপমান।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী কি করে ধর্মনিরপেক্ষ জনগণকে ''ওরা'' বলে উপহাস করতে ও উল্লেখ করতে পারেন? প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সার্বভৌম সমাজবাদী ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধানকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা ও তাকে রক্ষা করা তাঁর অবশ্য কর্তব্য। এ সত্ত্বেও তিনি প্রকাশ্যেই ধর্মনিরপেক্ষতাকে উপহাস করছেন এবং তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খোলাখুলি সংবিধান প্রদত্ত গণতান্ত্রিক অধিকারকে বিদ্রুপ করছেন।

এর চেয়েও জঘন্য ব্যাপার হল, টোকিওতে এক জনসমাবেশে পরিমণ্ডলের পরিবর্তন সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি প্রকৃতিকে শোষণ করার বিরুদ্ধে সতর্ক করতে গিয়ে সাম্প্রদায়িক 'গো হত্যা'র উপমাটি ব্যবহার করেন। তিনি বলেন, ''খুব বেশি হলে প্রকৃতিকে দোহন করার অধিকার আপনাদের আছে। আপনারা গরুর দুধ দুইতে পারেন, কিন্তু গরুকে হত্যা করতে পারেন না।'' মোদীর কাছে পরিমণ্ডলের পরিবর্তন বিষয়টিরও সাম্প্রদায়িকীকরণ ঘটানো যায় এবং তিনি সেটা এমন সময় করছেন যখন তাঁর সরকার আদিবাসী ও কৃষকদের কাছ থেকে গ্রাস করে বনজমি ও উর্বর জমির পরিবেশগত 'ছাড়পত্র' দিতে অত্যন্ত তৎপরতা দেখাচ্ছে, আর এ সবই করা হচ্ছে কর্পোরেট ও নির্মাণে যুক্ত হাঙ্গরদের সুবিধা দেওয়ার জন্য। ''মাওবাদ-এর মোকাবিলায় পরিকাঠামো নির্মাণ'' বনজমি গ্রাস করা একেবারে হালফিল অজুহাত হয়ে উঠেছে।

মোদী যখন বলেন, ''কোন লাল ফিতে নয় শুধুই লাল গালিচা'', তা শুধু জাপানি বিনিয়োগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। তিনি কর্পোরেশনগুলো ও বহুজাতিক সংস্থাগুলোর উদ্দেশ্যে বলছেন, পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং এই ধরনের বিষয়গুলো শুধুই ''লাল ফিতে''র ব্যাপার এবং তিনি এ সমস্ত কিছুকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে কর্পোরেশনগুলোর জন্য লাল গালিচা বিছিয়ে দেবেন! একইভাবে তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও বলছেন যে, আদিবাসী ও দলিতদের মানবাধিকার 'লাল ফিতে' মাত্র যেগুলো তিনি সামলাবেন যাতে পুলিশরা অবাধে রক্তপাত ঘটাতে পারে, কর্পোরেশনগুলোর জন্য জঙ্গলে লাল গালিচা বিছিয়ে দেওয়া যায়!

মোদী টোকিওতে কলেজের মেয়েদের সামনেও বলেন, ''কেবলমাত্র ভারতেই ঈশ্বরকে নারী রূপে ধারণা করা হয়েছে'' এবং ''হিন্দু দেবদেবীদের মধ্যে সরস্বতী হলেন শিক্ষামন্ত্রী, লক্ষ্মী হলেন অর্থমন্ত্রী এবং অন্নপূর্ণা হলেন খাদ্যমন্ত্রী।'' তবে এর সঙ্গে অসঙ্গত হল এই যে, ভারতের নারীরা বলছেন, বেদীতে শৃঙ্খলিত হয়ে তাঁরা দেবী হয়ে থাকতে চান না, মানুষ হিসেবে তাঁরা সম-অধিকার ও সম-স্বাধীনতার দাবি জানাচ্ছেন।

রাজ্যের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নসমূহ ও আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (আই এল ও)-র যুক্ত আবেদন

প্রিয় বন্ধু,

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (আই এল ও)-র ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে শ্রমিক, মালিক ও সদস্য দেশগুলোর সরকারের সমান প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে চলে। রাষ্ট্র সংঘের শ্রমিক অধিকার সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় এই সংস্থাটির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ২০১১ সাল অবধি মোট ১৮৯টি কনভেনশন (প্রথা) ও ২০২টি রেকমেণ্ডেশন (সুপারিশ) আই এল ও গ্রহণ করেছে। সদস্য দেশগুলো অধিকাংশ কনভেনশন মেনে চলবে আশা করা হলেও সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিটি কনভেনশনকে মান্যতা দিতে হয়। মান্যতা দেওয়ার পরে তা সম্পূর্ণভাবে মেনে চলা হচ্ছে কি না, সে সম্পর্কিত তথ্য ও প্রতিবেদন নিয়মিত আই এল ও-র সংশ্লিষ্ট কমিটিকে দিতে হয়। কোন দেশ মান্যতা দেওয়ার পরেও কনভেনশন লঙ্ঘন করছে এমন অভিযোগ উঠলে আই এল ও নির্ধারিত কমিটির নিকট বিশদ রিপোর্ট সরকারকে পাঠাতে হবে। আই এল ও গঠিত তদন্ত কমিটিকে পূর্ণ সহযোগিতা করা সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের পক্ষে বাধ্যতামূলক।

ভারতের পরিস্থিতি

ভারত আই এল ও-র সদস্য দেশ হলেও অধিকাংশ কনভেনশন ও সুপারিশগুলোর মান্যতা দেয়নি। উল্লেখ্য সমস্ত সদস্য দেশকে কনভেনশনগুলোর মান্যতা দেওয়ার কোনও বাধ্যতামূলক বিধি নেই। তাই ভারতের সংবিধানে সংগঠিত হওয়ার অধিকার স্বীকৃত অধিকার হলেও শ্রমিকদের সংগঠন গড়ে তোলার স্বীকৃতিস্বরূপ কনভেনশন ৮৭, যা আই এল ও ১৯৪৮ সালে গ্রহণ করেছে, ভারত সরকার আজও তার মান্যতা দেয়নি। অনুরূপে, সংগঠন গড়বার অধিকার এবং যৌথ দর কষাকষির অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন ৯৮ (আই এল ও গ্রহণ করেছে ১৯৪৯ সালে) ভারত সরকার মান্যতা দেয়নি। উল্লেখ্য ভারতের সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন আহূত সারা ভারত ধর্মঘটের দাবিগুলোর মধ্যে এই কনভেনশন দুটির মান্যতা দেওয়ার দাবিও যুক্ত হয়েছে।

এই কনভেনশনের স্বীকৃতি না থাকা, ভারতের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার না দেওয়ার সমতুল। কিন্তু আমাদের দেশের জনগণের মধ্যে তথা শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে এই অধিকারবোধ সংক্রান্ত চেতনা যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে একথা বলা যাবে না।

বুনিয়াদী শ্রম মান

আই এল ও গৃহীত ১৮৯টি কনভেনশনের মধ্যে ৮টি কনভেনশনকে চিহ্নিত করা হয়েছে বুনিয়াদী কনভেনশন হিসাবে। অর্থাৎ এই কনভেনশন গ্রহণ ও প্রয়োগের মান্যতার মধ্য দিয়ে সদস্য দেশ বুনিয়াদী শ্রমমানে উন্নীত হয়েছে ধরে নেওয়া হবে। সহজ ভাষায় বলা যায়—আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মূল্যায়নের নিরীখে ভারতের শ্রম মান বুনিয়াদী স্তরে পৌঁছাতে পারেনি। সংগঠিত হওয়ার অধিকার (কনভেনশন ৮৭) এবং যৌথ দর কষাকষির অধিকার (কনভেনশন ৯৮) ভারত সরকার মান্যতা দেয়নি। যদিও এই দুটি অধিকারই ভারতের সংবিধান অনুযায়ী মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে।

আই এল ও গৃহীত কর্মসূচী

আই এল ও-র শ্রমিকের অধিকারগত আন্দোলন সংক্রান্ত ব্যুরো (এ সি টি আর এ ভি) ভারতে ঐ কনভেনশনগুলোকে মান্যতা দেওয়ার জন্য ভারতের ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে যুক্ত করে একটি আন্দোলন গড়ে তোলার প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

এই প্রকল্পটির কাজ সব কটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নকে যুক্ত করে কয়েক বছর আগে থেকে তামিলনাড়ু রাজ্যে শুরু হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নগুলোর মধ্যে নানা মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এই যৌথ ফোরামের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে এই প্রকল্পের কাজ করার মধ্যে দিয়ে একটি অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। এই প্রচার কর্মসূচীগুলোর মধ্যে ছিল হ্যাণ্ডবিল, পোস্টার, কর্মীসভা, সেমিনার, স্বাক্ষর সংগ্রহ, মানব বন্ধন, ব্যানার, ট্যাবলো সহ মিছিল ইত্যাদি কর্মসূচী। তামিলনাড়ুতে এই প্রচার কর্মসূচীর সাফল্যের পর আরও ৬টি রাজ্যে (অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল) এই কর্মসূচী সম্প্রসারিত করা হয়েছে। আমরা জানি অধিকারবোধ সংক্রান্ত চেতনা যথেষ্ট দৃঢ় না হলে সংশ্লিষ্ট অধিকার আদায় করার জন্য দাবি উত্থাপন করা বা আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তোলার প্রচেষ্টা ফলবতী হয় না। তাই এই প্রচারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য অধিকারবোধ জাগিয়ে তোলা।

মারুতি কলঙ্ক

মারুতি সুজুকি তাদের মানেসর কারখানায় মালিকের পছন্দসই ইউনিয়ন ছাড়া কোন ইউনিয়ন গড়ে তুলতে দেবে না। মালিকের পাশে হরিয়ানার সরকার। তাই পেটোয়া ইউনিয়ন ১০০ জনের বেশী সদস্য জোগাড় করতে না পারলেও কয়েক হাজার কর্মীর সমর্থনপুষ্ট ইউনিয়নকে হরিয়ানা সরকার রেজিস্ট্রেশন দেয়নি। এখানেই শেষ নয়। মালিকের অপছন্দের ইউনিয়নের নেতৃত্ব প্রদানকারী ১৪৮ জন নেতা ও সংগঠককে আজও কারারুদ্ধ করে রেখেছে হরিয়ানা সরকার। এই তথ্য সারা পৃথিবীতে প্রচারিত হলেও আমাদের দেশের সব শ্রমিককে আমরা এ বিষয়ে অবহিত করতে পারিনি। তাই ব্যাপক প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে ওঠেনি।

এই প্রচার কর্মসূচীতে

আমরা কিভাবে লাভবান হতে পারি

উপরে হরিয়ানা রাজ্যের একটি উদাহরণ দিলেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত সারা ভারতের সমস্ত রাজ্যেই অনেক খুঁজে পাওয়া যাবে। আমাদের রাজ্যেও তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন শুধু নয়, রিটার্ণ জমা দেওয়ার ক্ষেত্রেও বাধা সৃষ্টি করছে। আপনারা আপনাদের জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই এটা জানেন। যে বহুজাতিক নিগমগুলো ভারতে শিল্প স্থাপন করতে আসছে তাদের মধ্যে অনেক দেশেই শ্রমিকদের এই অধিকারগুলো সুরক্ষিত। বাস্তবে তাদের ও দেশীয় মালিকদের চাপেই ভারত সরকার এই কনভেনশনগুলোর মান্যতা দিচ্ছে না। অনুরূপ কারণে রাজস্থান সরকার প্রচলিত শ্রম আইনগুলোর পরিবর্তন করে ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ভারত সরকারও শ্রমিকদের অর্জিত অধিকার হরণ করার উদ্দেশ্যে শ্রম আইনের অনেকগুলো পরিবর্তন প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। তাই এই আন্দোলনকে আমরা প্রচারের স্তর থেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের স্তরে নিয়ে যেতে পারলে ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার অর্জন, সম্প্রসারণ ও সংহত করা সম্ভব হবে।

অদ্যাবধি গৃহীত পদক্ষেপগুলো

১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ দিল্লীতে; ১১-১২ নভেম্বর, ২০১৩ এবং ২ থেকে ৪ জুন কলকাতায় আয়োজিত কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ শিবিরের মধ্য দিয়ে রাজ্য সমন্বয় কমিটি, রাজ্যস্তরে যৌথ মঞ্চ

সাতের পাতায় দেখুন

শ্রদ্ধাঞ্জলি

চলে গেলেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ বিপান চন্দ্র

চলে গেলেন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র। শনিবার ৩০ আগস্ট, ভোরবেলা, ঘুমের মধ্যেই। বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। এই বয়সেও চিন্তাভাবনা লেখালেখিতে সক্রিয় ছিলেন। হিমাচল প্রদেশের কাংড়া অঞ্চলে ১৯২৮ সালে বিপান চন্দ্রের জন্ম হয়। পড়াশোনা করেন লাহোর ফরম্যান ক্রিশ্চান কলেজে, তারপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। অধ্যাপনা জীবন দিল্লীর হিন্দু কলেজে শুরু হলেও কিছুদিন পরেই চলে আসেন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরুর দিন থেকে সেখানে তিনি অধ্যাপনা কাজে যুক্ত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য হিসেবে এবং ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি এদেশের জ্ঞানচর্চার জগতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। তাঁর ইতিহাস গবেষণার কেন্দ্রে ছিল উপনিবেশবাদ, জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ। মার্কসবাদী ইতিহাসচর্চার যে ধারাটি এ দেশে ক্রমশ বিকশিত হয়ে ওঠে সুশোভন সরকার, ডি ডি কোশাম্বী, রামশরণ শর্মা, রোমিলা থাপার, সুমিত সরকার প্রমুখদের মত বিপান চন্দ্র তাতে বিশেষ অবদান রেখেছেন।

বিপান চন্দ্রের 'ভারতের অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ' নামক বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৬ সালে। সেটিই বিপান চন্দ্রের প্রথম প্রাতস্বিক গ্রন্থ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ তাঁদের লেখা ও বক্তৃতামালায় ঔপনিবেশিক শাসনের আর্থিক শোষণের দিকটিকে কিভাবে সামনে আনছিলেন এবং সেইসূত্রে জাতীয়তাবাদের একটা বয়ান তৈরি হচ্ছিল, তার সীমাবদ্ধতাই বা কোথায় ছিল, বিপান চন্দ্র এখানে সেটিকেই গবেষণার বিষয় করেছেন। দাদাভাই নওরোজী, রমেশ চন্দ্র দত্ত এবং মাধব গোবিন্দ রানাডেরা ছিলেন এই সময়ের প্রধান জাতীয়তাবাদী অর্থনৈতিক বিশ্লেষক। বিপান চন্দ্র এই বইতে তাঁদের সম্পর্কে যেমন গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন, তেমনি অন্যান্য আরও অনেক নেতার এই সংক্রান্ত ভাবনাচিন্তা, লেখালেখি সামনে এনেছেন। এসেছে এই সময়ে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও এ বিষয়ে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা। যেমন ১৮৮৪ সালে সহচর পত্রিকা রেলপথের বিস্তার প্রসঙ্গে লিখেছিল,''লৌহপথের প্রসারের অর্থ আরও বেশী লৌহ শৃঙ্খলা''। ১৮৮৪ সালে জি ভি যোশী বলেছিলেন, রেলনীতি বিস্ময়করভাবে কম সময়ের মধ্যে দেশজ শিল্পকে ''পিষে মেরে ফেলে'' দেশকে দেউলিয়া করে দিয়েছে। ১৮৭০ সালে অমৃতবাজার পত্রিকা ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের জন্য অন্যতম কারণ হিসেবে ব্রিটিশ কর্তৃক সম্পদ নিষ্কাশনকে দায়ী করেছিল। ১৮৭২ সালে বিচারপতি রানাডে বলেছিলেন, ''বাস্তবে ভারতবর্ষের জাতীয় আয়ের এক-তৃতীয়াংশের বেশী ইংরেজরা কোন না কোন রূপে লুটে নিয়ে যাচ্ছে''। জি ভি যোশীর হিসেবও ছিল এ থেকে অভিন্ন। ১৮৮০ সালে দাদাভাই নওরোজী জোর দিয়ে বলেছিলেন, ''ভারত যে দুর্দশা কবলিত এবং ধ্বংসের সম্মুখীন তা নিদারুণ অর্থনৈতিক নিয়মের অভিঘাতে নয় বরং নির্দয়, সমবেদনাহীন ব্রিটিশ নীতির ফলে নির্দয়ভাবে ভারতবর্ষের মজ্জা নিংড়ে নেওয়ার এবং ভারত থেকে সম্পদ নিষ্কাশনের জন্য অর্থনৈতিক নিয়মের বিকৃতি ঘটিয়ে ভারতকে রক্তক্ষরণে বাধ্য করার জন্য। ভোলানাথ চন্দ্র ১৮৭৩ সালের প্রেক্ষাপটে লিখেছিলেন, ''সে সময়ে (ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়) ধনসম্পদ একটিমাত্র পথ দিয়েই নিষ্কাশিত হত। কিন্তু এখন এই নিষ্কাশনের পথের সংখ্যা অসংখ্য''।

কিন্তু বিপান চন্দ্র শুধু জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের আর্থিক শোষণের উন্মোচন সংক্রান্ত দিকটি এনেই থেমে যাননি, এর এক বিরাট সীমাবদ্ধতাকেও তিনি সামনে এনেছেন এবং তার কারণ বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। অর্থনৈতিক শোষণের নগ্ন বাস্তবতার এমন কিছু স্বীকৃতির পরও রানাডে, যোশী এবং নওরোজীর মত কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ শাসনাধীনে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করতেন এবং তাঁড়া 'হাড়ে-মজ্জায় ব্রিটিশ অনুগত-রাজভক্ত ছিলেন'। তাঁরা ছিলেন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-উপনিবেশবাদ টিকিয়ে রাখার পক্ষে। ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতীয় জনগণের সম্পদ লুট করে নিয়ে যাওয়ার মূল সমস্যাটাকে ''ভারতীয় নেতাদের মধ্যে রানাডে, যোশী, গোখলে এবং সম্ভবত আরও অনেকে ... প্রচার ও আন্দোলনের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হিসেবে ... গ্রহণ করতে চাননি। ... সম্ভবত তাঁরা চেয়েছিলেন প্রশ্নটা আরও কিছুদিনের জন্য শিকেয় তোলা থাক''। বিপান চন্দ্র কংগ্রেস নেতাদের পুঁজিপতি বান্ধব অবস্থান প্রসঙ্গে লিখেছেন, ''তাঁরা (কংগ্রেস নেতারা) পুঁজিপতিদের সমর্থন করতেন এই কারণে যে, তাঁরা বিশ্বাস করতেন ... দ্রুত শিল্পায়ন কার্যকরী করতে পারে একমাত্র এই শ্রেণী। তাঁরা শুধু এই অর্থে শিল্প পুঁজিপতিদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।''

ভারতের জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর বিপান চন্দ্রের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই আছে। এর মধ্যে অমলেশ ত্রিপাঠি ও বরুণ দের সঙ্গে যৌথভাবে লিখিত ''স্বাধীনতা সংগ্রাম'' নামক বইটি ভারতের স্বাধীনতা লাভের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয় ও বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে বিদ্যালয় স্তরে এই বিষয়ক পঠন-পাঠনের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব তৈরি করে। বইটির প্রথম দুটি অধ্যায়—ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব ও সংগ্রামের আদিপর্ব—লেখেন বিপান চন্দ্র এবং এখানে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত কালসীমা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। মহাবিদ্রোহ থেকে স্বাধীনতালাভ পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ অধ্যায় সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা পাওয়া যাবে 'ইণ্ডিয়াজ স্ট্রাগেল ফর ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' (১৯৮৯) বইতে।

ঔপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের ওপর তাঁর সামগ্রিক চিন্তাভাবনার বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রকাশিত হয় এসেস অন কলোনিয়ালিজম (১৯৯৯) এবং এসেস অন ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম (১৯৯৩) বই দুটি।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের ভারতবর্ষ সম্পর্কে ধারাবাহিক ইতিহাস বেশ কম এবং এক্ষেত্রে রামচন্দ্র গুহর 'ইণ্ডিয়া আফটার গান্ধী' এবং বিপান চন্দ্রর (তাঁর একদা ছাত্র ও পরবর্তী সময়ের সহকর্মী মৃদুলা মুখার্জী এবং আদিত্য মুখার্জীর সঙ্গে যৌথভাবে) ইণ্ডিয়া আফটার ইণ্ডিপেন্ডেন্স দুটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কাজ। একুশ শতক সূচনার প্রাক্কালে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ভারত সম্পর্কে বিপান চন্দ্র ও তাঁর সহ লেখকদের লেখা বইটিই প্রথম উল্লেখযোগ্য ইতিহাস। আটত্রিশটি অধ্যায়ে লিখিত বইয়ের (আমরা বইয়ের প্রথম সংস্করণকে ভিত্তি করেছি, পরে বইটির আরও সংস্করণ হয়েছে) প্রথম দিকে ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের রেশ থেকে শুরু করে জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহ্য, সংবিধান রচনার ইতিহাস ও তার মূল দিকগুলো, একটি জাতি-রাষ্ট্র হিসেবে ভারতকে গড়ে তোলার প্রাথমিক প্রয়াসগুলোর কথা, ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য বিভাজন, বিভিন্ন জাতি উপজাতিদের আত্তীকরণের মতো দিকগুলো আলোচিত হয়েছে। ১৯৫১ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত সময়কালকে আশাবাদের সময় হিসেবে বিপান চন্দ্ররা চিহ্নিত করেছেন। এই সময়ে কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল সম্পর্কে আলাদা দুটি অধ্যায়ে আলোচনা রয়েছে। লালবাহাদুর শাস্ত্রী থেকে ইন্দিরা জমানা, ইন্দিরা জমানার বিভিন্ন দিক, জয়প্রকাশের আন্দোলন ও জরুরী অবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানে রয়েছে। রাজীব জমানা ও নয়া উদারবাদী জমানার প্রথম দশ বছরের আলোচনার জন্য বরাদ্দ হয়েছে দুটি অধ্যায়। কালানুক্রমিক ইতিহাসের বাইরেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ নিয়ে বিপান চন্দ্ররা এখানে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যেমন বিভিন্ন রাজ্যের অশান্ত রাজনীতি বা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক প্যাটার্নের স্বরূপ। তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাবের রাজনীতি জাতীয় রাজনীতিকে কীভাবে উথাল-পাথাল করেছে তার মনোজ্ঞ আলোচনা এখানে উপস্থিত। ভারতীয় অর্থনীতির তিনটি পর্ব নিয়ে এখানে আলাদা আলাদা আলোচনা রয়েছে। নেহরুর সময়কালের অর্থনীতি, নেহরুর সময় থেকে উদার অর্থনীতি পর্যন্ত এবং '৯১ থেকে অর্থনীতি। ভূমিসংস্কার, কৃষি, জাতপাত, মহিলাদের অবস্থানের মত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়েও আলোক সম্পাতি আলোচনা এখানে পৃথকভাবে এসেছে। নিশ্চিতভাবেই আজকের দিনের যে কোনও সমাজ-রাজনীতি বিষয়ে আগ্রহী পাঠক বইটি থেকে চিন্তাভাবনার রসদ পাবেন।

জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলন নিয়ে বিপান চন্দ্রের বই 'ইন দ্য নেম অব ডেমোক্রেসি' এবং ভারতের বামপন্থী আন্দোলনের ধারা নিয়ে তাঁর লেখা বই 'দ্য ইণ্ডিয়ান লেফট'—সমাজবাদ ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে বুঝতে চাওয়া মানুষজনের কাছে বিশেষ আগ্রহের।

এই বইগুলোর মতই সমকালীন ভারতীয় রাজনীতিকে বুঝতে আগ্রহী মানুষজন পড়তে চাইবেন সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে বিপান চন্দ্রের মূল্যবান লেখাগুলো। 'কংগ্রেস নেহরু ও ভারতীয় মুসলমান' নামক পুস্তকটিতে বেশ কিছু চিন্তা উদ্দীপক অবলোকন পাওয়া যাবে। তবে এ প্রসঙ্গে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বই 'আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ'। আজকে গৈরিক ফ্যাসিবাদের মোকাবিলার জন্য মতাদর্শগত ও তথ্যগত হাতিয়ার শাণিত করার নিরীখ থেকে যে প্রস্তুতির প্রয়োজন, সেখানে এই বইটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। পরবর্তী সময়ে আলাদাভাবে এই নিয়ে আলাপ আলোচনার ইচ্ছে রইল।

- সৌভিক ঘোষাল

... যুক্ত আবেদন

ছয়ের পাতার পর

(জে এ এফ) গড়ে তোলা হয়। গত ৬ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রচার আন্দোলনের জন্য আঞ্চলিক স্তরে সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নকে যুক্ত করে ৪টি আঞ্চলিক যৌথ মঞ্চ গঠন করা হয়। গত ১৮ জুন, কলকাতায় এবং ২৫ জুন শিলিগুড়িতে আঞ্চলিক যৌথ মঞ্চের সদস্যদের সভা থেকে জেলাস্তরে যৌথ মঞ্চ গড়ার পরিকল্পনা করে প্রায় সব জেলাতেই সাংগঠনিক কাঠামো হিসাবে যৌথ মঞ্চ গড়া হয়েছে। অনেকগুলো জেলাতেই ইতিমধ্যে সাধারণ সভা করে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ শুরু হয়েছে।

কলকাতা আঞ্চলিক যৌথ মঞ্চের কর্মসূচী

২ সেপ্টেম্বর কলকাতা যৌথ মঞ্চের উদ্যোগে ট্যাবলো সহ প্রচার কর্মসূচী শুরু হয়েছে। এই কর্মসূচীটি আই এল ও সদর এবং দিল্লী কেন্দ্রের প্রতিনিধিবর্গের উপস্থিতিতে উদ্বোধন করা হয়। এই ট্যাবলো সহ প্রচার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হাওড়া ও হুগলী জেলায় ১০ দিন ধরে চলবে। এই প্রচারে অংশগ্রহণকারী শ্রমিক প্রতিনিধিরা সমাজের সব স্তরের মানুষের কাছে তাদের আবেদন নিয়ে যাবেন। দেশের সংবিধানে স্বীকৃত ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশন অনুযায়ী শ্রমিকের অধিকারের স্বীকৃতি ভারত সরকারকে দিতে হবে। গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে ভারত সরকারের নিকট এই দাবি পেশ করার জন্য আপনার সমর্থন রাজ্যের শ্রমিকেরা চায়।

আপনি সমাজের যে অংশেই অবস্থান করুন, দেশের তথা রাজ্যের শ্রমজীবী মানুষের প্রতি আপনার দায়বদ্ধতা আছে, এই আস্থা রেখে সারা রাজ্যে এই প্রচার আন্দোলনের সহযোগী শক্তি হিসাবে আপনাকে আমাদের পাশে চাই।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মিছিল

৯ সেপ্টেম্বর বালীতে বালী-কোন্নগর ইউনিটের পক্ষ থেকে একটি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মিছিল আয়োজিত হয়। গাজার মানুষদের সংহতি জ্ঞাপন এবং আমেরিকা ইজরায়েল সহ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে মুখরিত হয়ে ওঠে মিছিল। সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধেও শ্লোগান ওঠে। যা এলাকায় যথেষ্ট আলোচিত বিষয় হয়ে ওঠে।

বালীতে কমরেড অমল চ্যাটার্জীর স্মরণ সভা

২ সেপ্টেম্বর বালী সাধারণ গ্রন্থাগারে বি সি এম এফ (মহাদেও ইউনিট)-এর সহ-সম্পাদক অমল চ্যাটার্জীর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল। প্রয়াত অমল চ্যাটার্জীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন তাঁর স্ত্রী, বি সি এম এফ রাজ্য সভাপতি নবেন্দু দাশগুপ্ত সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। শ্রদ্ধার্ঘ্য পাঠ করেন বি সি এম এফ (মহাদেও)-এর সভাপতি দেবব্রত ভক্ত। বক্তব্য রাখেন নবেন্দু দাশগুপ্ত, বি সি এম এফ (বালী জুট)-এর সম্পাদক তপন ঘোষ, (মহাদেও ইউনিট)-এর আদেশ যাদব, সি পি আই (এম এল) বালী-বেলুড় সম্পাদক দীপক চক্রবর্তী, এ পি ডি আর (বালী)-র অচ্যুত সেনগুপ্ত, এ আই সি সি টি ইউ (হাওড়া)-র সম্পাদিকা মীনা পাল, এ আই এস এ নীলাশিষ বসু সহ অভ্যাগতরা। নবেন্দু দাশগুপ্ত বর্তমান সময়ে জুট শিল্পের পরিস্থিতিতে অমল চ্যাটার্জীর মত সাহসী, সুবক্তা ইউনিয়ন নেতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তিনি বলেন কমরেড চ্যাটার্জীর পরিবার সংগঠনের পাশে যেমন ছিল, তেমনি সংগঠনের সদস্যরাও পরিবারের পাশে থাকবে। অচ্যুত সেনগুপ্ত বলেন, কমরেড চ্যাটার্জী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ছাড়াও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াইয়ের পাশেও থাকতেন। মীনা পাল বলেন, শ্রমিক শ্রেণীর আত্মমর্যাদা বোধ প্রয়াত চ্যাটার্জীর মধ্যে ছিল। তাঁর আত্মমর্যাদায় যে আঘাত মালিকপক্ষের দিক থেকে লেগেছিল, তা পূরণ করার দায়িত্ব তাঁর কমরেডদের নিতে হবে।

সঙ্গীত পরিবেশন করেন সংযোগ সাংস্কৃতিক সংস্থা। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দেবব্রত ভক্ত, রাজেন্দ্র সাউ ও মমতাজ আলম। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে স্মরণসভা সমাপ্ত হয়।

সারদা কেলেংকারিতে যুক্ত তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার ও মুখ্যমন্ত্রীর জবাবদিহির দাবিতে

১৪ সেপ্টেম্বর (রবিবার) রাজ্য জুড়ে ধিক্কার দিবস

সি পি আই (এম এল) লিবারেশন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

বলরাজ পুরির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

শ্রী বলরাজ পুরি জম্মুতে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর প্রয়াণে ভারত হারাল মানবাধিকারের এক মহান প্রবক্তা এবং খ্যাতনামা এক রাজনৈতিক বিশ্লেষককে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন', শেখ আবদুল্লা ও পণ্ডিত প্রেমনাথ বাজাজ-এর সাথে ১৯৪৬-এর 'কাশ্মীর ছাড়ো আন্দোলন' এবং ডোগরার শাসক মহারাজা হরি সিং-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের মত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে যোগদান করেছিলেন। তিনি ১৯৪৭ সালে জম্মুতে সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়িয়ে পড়াকে রোধ করতে বা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়েছিলেন। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোতে কাশ্মীর সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাইতেন। পুরি, নেহরু ও শেখ আবদুল্লার মধ্যে ব্যবধানে সেতু রচনা করতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। তিনি ১৯৭৪ সালে ইন্দিরা গান্ধী ও শেখ আবদুল্লার মধ্যে চুক্তি সম্পাদনে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন।

পুরি বিভিন্ন ক্ষেত্রেই সক্রিয় ছিলেন—সক্রিয় সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে উচ্চমানের পঠন-পাঠন ও সাংবাদিকতা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাঁর ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র। তাঁর বন্ধু ও সাথীরা তাঁর বহুমুখী কার্যকলাপ নিয়ে অন্যত্র লেখালেখি করছেন। এখানে আমি মানবাধিকার ক্ষেত্রে তাঁর সক্রিয়তার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখব, যে কার্যকলাপে কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁর সাথে যুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

জয়প্রকাশ নারায়ন ১৯৭৪-এর এপ্রিলে দিল্লীতে সিটিজেনস ফর ডেমোক্র্যাসির সূচনা করেন এবং তিনি তার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হন। সেই সময় আমি তাঁর সংস্পর্শে আসি। তিনি ১৯৭৬ সালে গঠিত পি ইউ সি এল-এরও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তিনি বেশ কয়েক বছর ধরে এই উভয় সংগঠনের জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন এবং যথেষ্ট সক্রিয়তার স্বাক্ষর রেখেছেন।

কাশ্মীরে জঙ্গী কার্যকলাপের শুরু হয় ১৯৮৯-এর শেষের দিকে এবং ১৯৯০-এর জানুয়ারির শুরুতে জম্মু ও কাশ্মীর জগমোহনের অধীনে রাজ্যপালের শাসনাধীনে চলে আসে। জঙ্গী কার্যকলাপ চূড়ান্তভাবে বেড়ে ওঠে এবং তার পরিণতিতে বহু সংখ্যক মানুষকে হত্যা করা হয়—যাদের মধ্যে মুসলিম এবং অ-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষও ছিল এবং জঙ্গীরা যাদের সরকারের চর বলে মনে করত। এর ফলে ব্যাপক সংখ্যক কাশ্মীরী পণ্ডিত কাশ্মীর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। জঙ্গী ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ নিয়মিত ঘটনা হয়ে ওঠে এবং প্রতিশোধের লক্ষ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিবর্ষণে বহু সংখ্যক নিরীহ মানুষের মৃত্যু ঘটতে থাকে। প্রতিদিন ২১ থেকে ২২ ঘন্টা কার্ফু জারি হত যা সাধারণ মানুষের জীবনে চূড়ান্ত দুর্দশা ও কষ্ট নামিয়ে আনত। এই পরিস্থিতি কয়েক মাস বজায় থাকে। দেশপ্রেমিক ভারতীয় সাংবাদিকরা বলছিলেন, আরও রক্ত ঝরাতে হবে এবং তাঁরা জনগণকে বিদ্যুৎ, জল এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা সরবরাহ বন্ধ করার জন্য রাজ্যপালের কাছে আবেদন জানাচ্ছিলেন যাতে জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। উপত্যকার জনগণ মরীয়া হয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোর তদন্তের জন্য একটি দল পাঠাতে পি ইউ সি এল এবং সি এফ ডি-র কাছে আবেদন জানাতে থাকেন।

বলরাজ পুরির উদ্যোগে ও সহায়তায় ১৯৯০-এর মার্চের শেষ দিকে পি ইউ সি এল এবং সি এফ ডি-র সদস্যদের নিয়ে এই লক্ষ্যে একটি দল গঠিত হয়। ঐ দলের সদস্যরা ছিলেন বিচারপতি ভি এম তারকুণ্ডে (অবসরপ্রাপ্ত), বিচারপতি রাজিন্দার সাচার (অবসরপ্রাপ্ত), রাজিন্দার পুরি, ইন্দার মোহন, রঞ্জন দ্বিবেদি, ই এস আহুজা এবং আমি। প্রথম দিন এই ঘটনার তদন্তে আমরা যখন শ্রীনগরে হজরতবলে ছিলাম, সহসাই এ কে ৪৭ হাতে ৪-৫ জন জঙ্গী আবির্ভূত হয়ে আমরা কারা এবং কি উদ্দেশ্যে এসেছি তা জিগ্যেস করতে শুরু করল। আমাদের স্থানীয় পথপ্রদর্শক কাশ্মীরী ভাষায় তাদের সঙ্গে আলোচনা করল। দলের সদস্যরা হিন্দু সে কথা জঙ্গীরা জানতে পারলে আমাদের ক্ষতি হতে পারে ভেবে সে জঙ্গীদের বলল যে আমরা হিন্দু নই, বরং খ্রিস্টান। আমরা কাশ্মীরি ভাষা জানতাম না, কিন্তু বলরাজ পুরি জানতেন। যখনই তিনি শুনলেন যে পথপ্রদর্শক আমাদের খ্রিষ্টান বলে বর্ণনা করেছে, তিনি রেগে গেলেন এবং বকাবকি করলেন। তিনি জঙ্গীদের বললেন, আমরা খ্রিষ্টান নই, আমরা হিন্দু। আমরা কোন সরকার বা দলের প্রতিনিধিত্ব করছি না। আমরা ভারতীয় মানবাধিকার সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিত্ব করছি এবং উপত্যকায় এসেছি 'ইনসানি হাকুক'-এর জন্য। জঙ্গীরা বিভ্রান্ত হয়েছে বলে মনে হল এবং নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলোচনার পর ওরা চলে গেল।

যে রিপোর্ট ঐ দল প্রকাশ করে তা জগমোহনের শাসনের অন্ধকারময় দিককে উন্মোচিত করে এবং তা নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যাপক আলোচনা ও বিতর্ক হয়। পরবর্তীতে বেশ কয়েকটি দলই কাশ্মীর উপত্যকা পরিদর্শনে যায় এবং তার অধিকাংশতেই বলরাজ পুরি হয় সদস্য না হয় তাদের পরামর্শদাতা ছিলেন। তিনি শুধু কাশ্মীরের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ইস্যুগুলোকেই তুলে ধরেননি; পাঞ্জাব, উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং ভারতের অন্যান্য অংশের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ইস্যুগুলোকেও তুলে ধরেছেন।

মানবাধিকারের ইস্যুগুলোর প্রতি তাঁর গভীর অঙ্গীকার ছিল এবং তাঁর সারা জীবনই নিবেদিত হয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার স্বার্থে। তিনি সবসময়েই আমাকে এবং অন্যান্যদের মানবাধিকার আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করেছেন। - **এন ডি পাঞ্চলি**

ব্যাপক অর্থের কারচুপি ধরা পড়ল বেহালা সিরিটি পোস্ট মাস্টারের

যখন চারিদিকে সারদা সহ বিভিন্ন চিটফাণ্ডগুলো ব্যাপক সাধারণ মানুষের কারচুপি করছে তাই নিয়ে সারদা ও সি বি আই-এর মধ্যে টানাপোড়েন চলছে তখন বিভিন্ন পোস্ট অফিসগুলোতে ব্যাপক মানুষের টাকা শাসক দলের প্ররোচনায় নির্দ্বিধায় তছরূপ করে চলেছে। সেরকমই বেহালা সিরিটির পোস্ট মাস্টার এক গরিব রিক্সা চালকের ১০ হাজার টাকা নির্দ্বিধায় তুলে নিয়েছিল এবং দীর্ঘদিন ধরে তাকে নানা অজুহাতে বারংবার ফিরিয়ে দিয়েছে। এমত অবস্থায় সেই রিক্সাচালক সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের কালিতলা ব্রাঞ্চের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তৎক্ষণাৎ কালিতলা অফিসের সদস্যরা হস্তক্ষেপ করে। প্রথম অবস্থায় পোস্টমাস্টার চুরির ঘটনা অস্বীকার করে, শেষে সি পি আই (এম এল) সদস্য ও এলাকার জনগণের চাপে পড়ে পোস্টমাস্টার চুরির ঘটনা স্বীকার করে ও পার্টির সদস্যদের এবং জনগণের সামনে কথা দেন যে তিনি ঐ ব্যক্তিকে সুদসহ টাকা ফেরত দেবেন। এদিকে কমরেডরা এলাকায় প্রচার ও পোস্টারিং চালাতে থাকেন। এমতাবস্থায় শাসক দলের হুমকির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে জনগণকে সাথে নিয়ে সুদসহ বকেয়া টাকা আদায় করে নেন। এই আন্দোলনের পুরভাগে নেতৃত্ব দেন সি পি আই (এম এল) কালিতলা ব্রাঞ্চের সম্পাদক মিথিলেশ সিং, বাবু ভট্টাচার্য, কমলেন্দু সরকার, রণজিৎ কর্মকার প্রমুখ।

বর্ধমানে অখিল ভারতীয় কিষাণ মহাসভার

জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা

বর্ধমান শহরের ''বন্ধন'' বাড়িতে চলছে সর্বভারতীয় কিষাণ মহাসভার বৈঠক

সারা ভারত কিষাণ মহাসভার রাজ্য শাখা পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সমিতির এক প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়েছে—বর্ধমান শহরের 'বন্ধন' হলে ২ দিনব্যাপী (৬-৭ সেপ্টেম্বর) জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কৃষক নেতৃবৃন্দ দেশব্যাপী কৃষকদের সামনে উপস্থিত সংকট সম্পর্কে গুরুত্ব দিয়ে মত বিনিময় করেন। এই সভা হল এমন এক সময়ে যখন পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের শাসনাধীনে উদ্বেগ-অসন্তোষ ব্যক্ত হচ্ছে বিশেষ করে চা শ্রমিকদের অনাহারে ব্যাপক সংখ্যায় মৃত্যু ও পাটচাষীরা ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের চেয়ে অনেক কম দাম পাওয়াতে। সভায় সভাপতিত্ব করেন রুলদু সিং এবং সভা পরিচালনা করেন জাতীয় সাধারণ সম্পাদক রাজারাম সিং।

রাজারাম প্রেস বিবৃতিতে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, মোদী সরকার পুঁজিপতি ও কর্পোরেটদের স্বার্থে জমি অধিগ্রহণ আইনে বড় ধরণের রদবদল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। খাদ্য উৎপাদনে জি এম বীজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের স্থগিতাদেশ থাকা সত্ত্বেও তা ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে ভারতীয় কৃষি এবং কৃষকদের ওপর বহুজাতিক সংস্থাগুলোর হামলার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে ফেলেছে। কিষাণ মহাসভা মোদী সরকারের কৃষক বিরোধী কর্মসূচীর তীব্র বিরোধিতা করছে।

এ আই কে এম নেতা আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলোকে সার্কুলার দিয়ে আখ চাষীদের বোনাস না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের মতে, যদি রাজ্য সরকার বোনাস দেয় তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে দেওয়া সাহায্য থেকে আখ চাষীর বোনাস বাবদ দেওয়া টাকা কেটে নেবে। এই হুমকী সরাসরি আখ চাষীদের অধিকারের ওপরে প্রত্যক্ষ হামলা। কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতির ফলে ব্যক্তিমালিকনাধীন চিনি কল মালিকদের চাষীদের ওপর হামলা আরও বেড়ে গিয়েছে। আজ উত্তরপ্রদেশে এক ডজন আখ কল (চিনিকল) মালিক মিল বন্ধ করার বা ২২০ টাকা প্রতি কুইন্ট্যাল দরে আখ কেনার হুমকী দিয়েছে। কিষাণ মহাসভা আখ চাষীদের স্বার্থে ও কল্যাণের পক্ষে সংগ্রামরত আছে।

কিষাণ মহাসভা পাঞ্জাব সরকার দ্বারা পানীয় জলের ওপর কর প্রত্যাহার করা ও ক্যানেলের জল সরবরাহের সময়সীমা বাড়াবার দাবি করছে, সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাব সরকার দ্বারা কৃষক আন্দোলনকে দমন করার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত ''পাবলিক-প্রাইভেট সম্পত্তি ক্ষতি বন্ধ বিল'' অবিলম্বে প্রত্যাহার করার দাবি করছে।

কিষাণ মহাসভা মোদী সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে, নির্বাচনে দেশের কৃষকদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুসারে স্বামীনাথন কমিটি রিপোর্ট অনুযায়ী কৃষককে তার কৃষি উৎপাদনের মূল্যে ৫০ শতাংশ অতিরিক্ত মূল্য যোগ করে কৃষকদের টাকা দিতে হবে। একইসাথে সরকারের প্রতিশ্রুতি মত বিহারের ভুট্টা চাষীদের থেকে সরকারি সাহায্য মূল্যে তাদের ফসল কেনা সুনিশ্চিত করতে হবে। এবং এই সভা বিহার সহ সারা দেশে খরা কবলিত অঞ্চলের কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানায়। পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার প্রান্তিক, ক্ষুদ্র, মধ্য কৃষক সহ লক্ষ লক্ষ কৃষিমজুর সারদা স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পের ফাঁদে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। কিষাণ মহাসভার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার পক্ষে সারদা কেলেঙ্কারীর সাথে যুক্ত তৃণমূল নেতৃত্বের বিচারের দাবি জানানো হয়েছে। কৃষিতে সাম্রাজ্যবাদী কর্পোরেট লবির হামলার বিরুদ্ধে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৮-১৫ অক্টোবর দেশব্যাপী প্রচার বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিষাণ মহাসভা।

কিষাণ মহাসভার সাধারণ সম্পাদক আরও বলেন, বিজেপি-সংঘ পরিবার আজ তাদের সাম্প্রদায়িক ও বিভেদকামী নীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কৃষকদের ঐক্য ভাঙতে মরীয়া হয়ে উঠেছে। আর, নরেন্দ্র টিকায়েতের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়নও এই বিভেদকামী রাজনীতির অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। এই সময়ে কৃষকদের সংগ্রামী ঐক্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এবং কৃষক আন্দোলনের ব্যাপকভাবে বিস্তার ঘটানোর জন্য সমমনোভাবাপন্ন সংগ্রামরত কৃষক সংগঠনগুলোর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা কিষাণ মহাসভা চালিয়ে যাচ্ছে। বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, অন্ধ্রপ্রদেশ ইত্যাদি রাজ্য থেকে কৃষক নেতারা পূর্বোক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

● বন্ধ কারখানা খোলার দাবিতে ● চা বাগানে অনাহার মৃত্যুর প্রতিবাদে ● দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি রোধে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে ● সারদা আর্থিক কেলেঙ্কারিতে যুক্ত নেতা-মন্ত্রীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ● ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে

গণমঞ্চ-র আহ্বানে ২২ সেপ্টেম্বর (সোমবার)

বিক্ষোভ মিছিল ও সভা

মিছিল শুরু ঃ কলেজ স্কোয়ার, বেলা ১২.৩০টা ।। সভা ঃ ওয়াই চ্যানেল, ধর্মতলা

বক্তা ঃ দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, রেজ্জাক মোল্লা, প্রসেনজিৎ বসু, অমিতাভ চক্রবর্তী, কুণাল চট্টোপাধ্যায়

সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক কার্তিক পাল কর্তৃক ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৫৪ হইতে মুদ্রিত ২১/১/১ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী। ₹ ৩ ও ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ২২৬৫ ১৬৭৯ e-mail : cpimlwb@yahoo.com//deshabrati@gmail.com